

নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্মঃ ফিরে দেখা

শহিদুল ইসলাম

এক

কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম মুজফ্ফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথায়' আমাদের জানিয়েছেন যে 'নজরুল ইসলামের জীবন নিয়ে লেখা পুস্তকগুলির মধ্যে আমি ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত লিখিত 'নজরুল-চরিতমানস কেই' শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকি।'^১ তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বার বার সুশীলবাবুর 'নজরুল চরিতমানসের' শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন আমার মতে ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত রচিত 'নজরুল চরিতমানস' উচ্চতম আসন পাওয়ার দাবী রাখে।'^২ তারপরও মুজফ্ফর আহমদ ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের কিছু মত খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি নিয়ে মুজফ্ফর আহমদ ডঃ গুপ্তের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন তাহল কাজী নজরুল ইসলামের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব নিয়ে। আহমদ তাঁর বই এর 'রুশ বিপ্লব, লাল ফৌজ ও কাজী নজরুল ইসলাম' অনুচ্ছেদে প্রমান করার চেষ্টা করেছেন 'রুশ বিপ্লব ও লাল ফৌজের প্রতি নজরুলের একটা আকর্ষণ জন্মেছিল।'^৩ ১৯৫৭ সালের ৬ জুন তারিখে চাঁচড়ার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের পল্টন জীবনের বন্ধু জমাদার শঙ্করায়ের পত্র পড়ে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করেন যে 'নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।'^৪ বইএর অন্যত্র আহমদ বলেছেন 'আসল কথা হচ্ছে এই রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব ও লালফৌজের লড়াই নজরুল ইসলামের মনে সাড়া জাগিয়েছিল?'^৫ অন্যত্র বলেছেন 'রুশ বিপ্লব দ্বারা নজরুল ইসলাম সত্যই প্রভাবিত হয়েছিলেন'^৬ মুজফ্ফর আহমদের এমত সমর্থন করেন আর একজন মাস্টারী নজরুল গবেষক নারায়ন চৌধুরী।'^৭ অন্যদিকে ডঃ সুশীল গুপ্ত তার বইতে জানান যে 'মুজফ্ফর সাহেব গুপ্ত 'ব্যথার দান' গল্পটির প্রসঙ্গ নিয়ে নজরুলের উপর রুশ প্রভাবের কথা দৃঢ়বশ্তে ব্যক্ত করেছেন।'^৮ কিন্তু সুশীল গুপ্ত এখানেই থেমে থাকেন না। মুজফ্ফরের সঙ্গে মাত্রাগত পার্থক্য রচনা করতে চান। তিনি বলেন 'নজরুল সে সময় তাঁর লেখায় লালফৌজ কথাটি ব্যবহার করলেও এবং 'লালফৌজের' মহৎ আদর্শের কথা তুলে ধরলেও একথা বলা বোধ হয় ঠিক নয় সে তিনি সচেতনভাবে রুশবিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বা তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।'^৯ সুশীল গুপ্তের 'বোধহয় ঠিক নয়' বাক্যাংশের ওপর আমি গুরুত্বারোপ করতে চাই। 'ব্যথার দান' গল্পটি ১৩২৬ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' মাঘ সংখ্যায় প্রথম ছাপা হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯১৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একদিনে জানান মুজফ্ফর আহমদ।'^{১০} ইংরেজি তারিখটি নিয়ে মুজফ্ফর আহমদের মনেও সংশয় রয়ে গেছে বইটি ভালভাবে পড়লে বোঝা যায়। নজরুল ইসলামের যেসব কবিতায় সাম্যবাদের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে অর্থাৎ যেসব কবিতা পাঠে আমরা পাঠকেরা তাঁকে সাম্যবাদের কবি আখ্যায় ভূষিত করে থাকি, সেসব কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ১৯২৫ সালে 'সাম্যবাদী' এবং ১৯২৬ সালে 'সর্বহারা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। 'সাম্যবাদী' গ্রন্থে 'সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'মানুষ' 'পাপ' 'চোরডাকাত' 'বারাঙ্গনা' 'মিথ্যাবাদী' 'নারী' 'রাজাপ্রজা' 'সাম্য' ও 'কুলি-মজুর' এই

সাহিত্যিকী

এগারটি এবং ‘সর্বহারার’ গ্রন্থে ‘সর্বহারার’ ‘কৃষানের গান’ ‘শ্রমিকের গান’ ‘ধীবরের গান’ ‘ছাত্রদলের গান’ ‘কাভারী হুঁশিয়ার’ ‘ফরিয়াদ’ ‘আমার কৈফিয়ৎ’ ‘প্রার্থনা’ এবং ‘গোকুল নাগ’ দশটি কবিতা স্থান পায়। এসব কবিতা বহুল পঠিত এবং আদরনীয়। এসব কবিতা পড়ে নজরুলের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার সুশীল গুপ্ত লেখেন ‘সর্বহারার মধ্যে নজরুলের সাম্যবাদী ধারণা প্রকাশিত হওয়াতে এই গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব বর্তমান। একথা ঠিক যে নজরুল মাস্ট্রীয় তত্ত্ব কখনও ভালভাবে পাঠ করেন নি এবং যেহেতু মাস্ট্রীয় তত্ত্ব ভালভাবে আয়ত্ত না করলে সত্যিকার কমিউনিষ্ট হওয়া যায় না, সেই কারণে নজরুলকে কমিউনিষ্ট বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁকে বহু দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করতে হয়েছিল। মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাহচর্যও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর উপর রুশবিপ্লবের সাফল্যমণ্ডিত ঘটনাবলী তাঁর কবি মানসকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই তাঁর পক্ষে ‘সাম্যবাদী’ কবিতাও লেখা সম্ভব হয়েছিল। নজরুলের সাম্যবাদ তাঁর অন্তরেরই প্রেরণালব্ধ জিনিস ও নিজস্ব কবি কল্পনার রসে রসিন। গভীর ও ঘনিষ্ঠ মানবতাবোধই এই সাম্যবাদের ভিত্তি। মানুষের ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করেন নি। নরনারীর মধ্যে অধিকার বৈষম্যের তিনি বিরোধী। তিনি সর্বধর্মের উপর মানব ধর্মকেই উচ্চতম স্থান দিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সাম্যবাদ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে না। এক ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা নজরুলের সাম্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।^{১১} নারায়ণ চৌধুরীও তাঁর বইএর ‘রুশবিপ্লব ও কাজী নজরুল’ অনুচ্ছেদে স্বীকার করেছেন ‘নজরুল কিন্তু বরাবরই সাম্যবাদের রাস্তা ধরে চলেছেন। তবে একথা ঠিক, তাঁর সাম্যবাদী প্রত্যয় যতনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল ভাবাবেগের আধারে স্থাপিত। এক ধরনের ভাবালুতাও আবেগসর্বস্বতা তাঁকে সাম্যবাদের পথে চালিত করেছিল।’^{১২} এখানে মার্কসবাদী নারায়ণ চৌধুরী স্পষ্টভাবে ডঃ গুপ্তের মতকে সমর্থন জানিয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদও বলেন ‘তাঁর ‘বিদ্রোহী’ যুগের প্রায় সমস্ত কবিতায় এই সাম্যবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু পুরোপুরি সাম্যবাদী নজরুল কখনো হয়নি, হলে তাঁর এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে ‘খালেদ’, ‘ওমর’ ‘জগলুল’ প্রভৃতি ‘প্যান ইসলামী’ ভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। সাম্যবাদের প্রভাবে তাঁর মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানবতার জন্য তাঁর দরদ।’^{১৩}

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন নজরুল ইসলামের একজন ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। তাঁর ‘philosopher and guide’ বলা যাবে কি না, আমি জানি না। আর কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মতে নজরুলের শ্রেষ্ঠ চরিতাকার হলেন ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত। নজরুল ইসলামের ওপর রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব নিয়ে এই দুই মহারথীর বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার আমার কোনই যোগ্যতা নেই। তাই এ বিষয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করতে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ও সংকুচিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গটিকে ঘিরে আমার মনের দীর্ঘ দিনের একটি প্রশ্ন সামনে উঠে এল। সে কারণেই আমি সে ধৃষ্টতা দেখাতে সাহসী হয়েছি। সেই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর

পেলে তাঁদের এ বির্তকের অবসান হবে বলেই আমার মনে হয় এবং তখন নজরুলকেও এ সম্পর্কে তার যথাযথ স্থানে স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাই সাহস করে এই এক কঠিন বিষয়ে নাক গলাতে উদ্যোগী হয়েছি সামান্যমাত্র পুঁজি নিয়ে। মুজফ্ফর আহমদ সুশীল গুপ্তকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর বইতে বলেছেন ‘কাজী নজরুল ইসলামের জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে সে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই তাঁকে আঁকতে হবে। নিজের মনের রঙ দিয়ে নজরুলের কোনো চরিতাব্যাস যদি তাঁর চিত্র আঁকতে চান তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল চিত্র আঁকবেন।’^{১৪} মুজফ্ফরের এই সাবধান বাণীটি মনে রেখে বলবো মুজফ্ফরের মতে যদি সুশীলগুপ্ত তাঁর মনের রঙ মিশিয়ে নজরুলের চরিত্র নির্মাণ করে বিদ্রুত ভুল করে থাকেন, তাহলে মুজফ্ফর আহমদও তাঁর মনের রঙ মিশিয়ে নজরুলের জীবনী রচনা করতে গিয়ে একই ভুল করেছেন। আসলে কেউ যখন কারো জীবনী রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর মনের রঙে রাঙিয়ে নেবার প্রবণতা তার মধ্যে থাকে প্রবল। প্রায় সবাই নিজের মনের রঙেই সবাইকে বিচার করেন। একেবারেই নিরপেক্ষভাবে কাউকে বিচার করা কি সম্ভব আমি বলতে পারবো না। মুজফ্ফর আহমদের ভাষায় ডঃ গুপ্ত লালাতরু থেকে নজরুলকে বিচার করেছেন ‘তিনি কিছুতেই ‘লালকে’ বরদাশত করতে পারছেন না।’^{১৫} তেমনি মুজফ্ফর আহমদের বিরুদ্ধে যে কেউ অভিযোগ তুলতে পারেন সে তিনি অতি ‘লালাসক্ত’ হয়ে নজরুলকেও অতি লালে রাঙিয়ে নিয়েছেন।

আর একটি কথা বোধহয় সবাই স্বীকার করবেন। কেবল বুদ্ধির মাপে একজন বড় সৃজনশীল হৃদয়ের কারবারীর চরিত্র অঙ্কন করতে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। উদাহরণ হিসেবে ফকির লালন শাহের কথা বলা যায়। সমগ্র বিশ্বের সামনে রবীন্দ্রনাথই লালনকে তুলে এনেছিলেন। তাঁর ‘মানুষের ধর্ম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লালন ও বাউলদের নিয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন পরবর্তী কোন গবেষকের গবেষণায় সেই জীবনবোধ কাজ করতে দেখা যায় না। কারণ উভয়েই ত্রুটি। আর উভয়ের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানুষ কেবলই মানুষ; ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, জাত-পাত নয়। মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এমন কিছু নয়। লালন ছিলেন একজন ভবঘুরে ফকির, যার কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বশিক্ষিত আধুনিক মন মানসিকতায় সিক্ত একজন কবি। কিন্তু উভয়ের চিন্তার কি অপূর্ব মিল! সেই মিলের কথাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় তুলে ধরেছিলেন। লালন তাঁর ‘অমার্জিত’ গ্রাম্যভাষায় যা বলেন রবীন্দ্রনাথ সেই মানব কেন্দ্রিকতাকে স্পষ্ট করে তুলে বলতে পারেন ‘মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ।’^{১৬} এমন একটি মহৎ বাক্য কি কেবল বুদ্ধি দিয়ে লেখা যায়? অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসা এ বাক্য। ‘ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ’ ধর্মাবতারা একথা হাজার বার কপচালেও প্রমাণ হয় না সে সত্যি মানুষ শ্রেষ্ঠ। তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে শ্রেষ্ঠ। তার মহত্ত্ব প্রমাণের মধ্য দিয়েই সে প্রমাণ করতে পারে যে সে সত্যি শ্রেষ্ঠ-অতীব্র সে মানুষ। এখানেই এসে মিলে যায় লালনে রবীন্দ্রনাথে। যে লালন জাতের কিরূপ কখনও চোখে দেখেন নি, যে লালন জাতকে হাতে পেলে আঙনে পোড়াতেন, আমরা যারা বুদ্ধির ব্যাপারি, মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছুর বিচারে অভ্যস্ত, বিদ্যায়তনের শিক্ষায় গর্বিত, তারা লালনের জাত খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তাই বলছিলাম ভারতের

সাহিত্যিকী

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ এবং শ্রেষ্ঠ নজরুল জীবনী রচয়িতা ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত উভয়েই তাঁদের উচুস্তরের মেধা মনন ও বুদ্ধি দিয়ে সর্বহারার কবি, সাম্যবাদীর কবি বাউগ্লে নজরুল ইসলামকে বিচার করতে বসেছেন। আমিও একজন বুদ্ধির ব্যাপারি। বুদ্ধির মাপকাঠি নিয়েই নজরুল প্রতিভার একটি বিতর্কিত দিক নিয়ে বিচার করতে বসেছি। তবে আবারও স্বীকার করতে আমি লজ্জিত হব না যে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তের মত বড় মাপের বুদ্ধিমান আমি নই। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি নিয়েই নজরুলকে বিচার করতে সাহসী হবার দৃষ্টতা প্রকাশ করেছি।

দুই

অনেক বছর আগে আমি যখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস পড়ি তখন একটা বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাহল প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনে অধিকহারে মুসলমানের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদানের ইতিহাস। কেননা জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর যে কটা বছর পৃথিবীতে বেঁচে আছি, সে কটা বছরে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মুসলমানেরা সাধারণ ভাবে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধী। পাঠকরা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে মুসলমান সাধারণভাবে ঈশ্বরহীন মার্কসবাদকে কখনই গ্রহণ করেনি। আমার জীবদ্দশায় আমি এ সত্য উপলব্ধি করেছি। তাই প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের উষালগ্নে মুসলমানদের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। বিপ্লবের পর পরই ভারতের মুসলমানরা কমিউনিষ্ট হয়ে গেল, এর মাজেজা আমি বহুদিন বুঝতে পারিনি! এ বিষয়টি আমি আমার মাথা থেকে কখনই বের করে দিতে পারিনি। প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। বিষয়টা আমার মত আরো অনেকের দৃষ্টিতে পড়ে। যেমন ভারতীয় ইতিহাসবিদ জয়তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার যুক্তি হল 'ভারতের অভ্যন্তরে রুশ বিপ্লব ক্ষুদ্র একটি ডেউ-এর অতিরিক্ত বিন্দু সৃষ্টি করতে পারেনি।...কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান অক্টোবর বিপ্লবকে অভিনন্দিত করে অর্থাৎ কিনা সবচাইতে পশ্চাদপদ, অস্ত্র এবং কঠোর ধর্মীয় গোষ্ঠি মাত্র এ-দলের অন্তর্ভুক্ত।'^{১৭} তিনি আরো লেখেন যে 'রুশ বিপ্লব অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর আপাত দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বহুতঃ তেমন কাউকে তিনি দেখতে পান নি।'^{১৮} এটা মিথ্যা নয় সে রুশ বিপ্লব সংঘটিত ও বলশেভিক সরকার গঠিত হবার পর রুশ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী এবং ভারত থেকে হিজরতকারী মুসলমানরা সে বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়েছিল। জয়তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরো অনেককে তা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। বিশ্বাস হতে চায় নি। কারণ একটা গুণগত বিপ্লব হল আর মানুষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সবাই কমিউনিজমে দীক্ষা গ্রহণ করল, এটা আমার কখনও বিশ্বাস হয়নি। এটা সম্ভব নয় বলে আমার মনে হয়েছে। সন্দেহ হয়েছে সাম্যবাদের প্রতি মুসলমান বা ভারতীয় প্রবাসীদের আগ্রহের পিছনে অন্য কোন কারণ আছে। মার্কসবাদ নয়। এ কারণই খুঁজেছেন এম.এ. পারসিৎস তাঁর বিখ্যাত বইতে।'^{১৯}

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরক জামানির পক্ষে যোগ দেয়ায় ভারতের মুসলমান এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। অবস্থাটা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি লিখেছেন 'একদিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার

প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের খলিফা হিসেবে তুর্কীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য-এই দুইএর দ্বন্দ্ব (ভারতে) মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা করে।^{২০} এই দ্বন্দ্ব 'শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ব্যাপকতম অংশ সুলতানের নেতৃত্বাধীন খেলাফতকে রক্ষার জন্য বৃটিশ বিরোধিতার পক্ষ গ্রহণ করেন।'^{২১} গড়ে ওঠে খেলাফত আন্দোলন। ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাময়িকভাবে হলেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং মহাত্মা গান্ধী ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানান।^{২২} অল্পবয়সের জন্য হলেও খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন একত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে বৃটিশ বিরোধীতার কারণে খেলাফত আন্দোলন যতটুকু সার্থক ভূমিকা রেখেছিল, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নবজীবন দানকারী আন্দোলন হিসেবে তার চেয়ে বেশী নঞচক্ ভূমিকা পালন করেছিল। সেকথা উমর তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। আসলে খেলাফত আন্দোলন ছিল একটি ধর্মীয় আন্দোলন। চরিত্রের দিক থেকে প্যান-ইসলামিক। সমগ্র আন্দোলনের ভিত্তি দাঁড়িয়েছিল রক্ষণশীলতার ওপর। তবে সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ-বিরোধী হওয়ায় তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের কাছে কৌশলগত কারণে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

১৯১৭ সালে ভারতে খেলাফত আন্দোলন গড়ে উঠলেও ১৯২০ সালে তা প্রবল হয়ে ওঠে। তবে 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে 'জানান মুজাফফর আহমেদ'।'^{২৩} এই খিলাফৎ আন্দোলন থেকে হিজরৎ আন্দোলন শুরু হয়। কমরেড মুজাফফর আহমেদ জানাচ্ছেন 'প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভারতের মুসলমানদের সাহায্য একান্তভাবেই পেতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকটে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এসিয়া মাইনর ও থ্রেসের তুর্কি জাতি অধ্যাসিত প্রাচুর্যময় প্রসিদ্ধ ভূমি হতে তুর্কিকে বঞ্চিত করার জন্যে আমরা এই লড়াই করছি না।'^{২৪} কিন্তু 'কমরেড' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৯২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে একটি খিলাফৎ ডেপুটেশন লন্ডনে গেল। কিন্তু লয়েড জর্জ তার ওয়াদা পালন করলেন না। এই খবর দেশে পৌছামাত্র ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসেই একটা হিজরৎ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।'^{২৫} মুসলমানরা বৃটিশ অধিকৃত ভারতকে 'দারুল-হারব' মনে করে এবং ভারত বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে। বোঝা যায় এই দেশাত্যাগের পিছনেও ছিল ধর্মীয় কারণ। সেভার্সের চুক্তির বিরোধিতা করাই ছিল মূল লক্ষ্য। মিত্র-শক্তি কর্তৃক ইসলামি তুরস্ককে টুকরো করা এবং সকল বিশ্বাসীদের খলিফাকে বার্ষিক বন্দি করার বিরুদ্ধে-প্রতিবাদ জানাতেই এই দেশাত্যাগের হিড়িক। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খেলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং তার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে ১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর। প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন ফজলুল হক এবং গান্ধী, নোহরু, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেস নেতা সেখানে উপস্থিত থাকেন। ২৪ নভেম্বর খেলাফত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২০ সালের ১৮ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহর এক বাণী পাঠ করা হয়। সেখানে তিনি মুহাজিরিনদের আফগানিস্তানে চলে আসার আহবান জানান।

সাহিত্যিকী

তিনি তাদের রাজনৈতিক অশ্রয় এবং অন্য সকল ধরনের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। এটা কাবুল সরকারের ব্রিটিশ বিরোধী সিদ্ধান্ত। মুজফ্ফর আহমেদ ডাক্তার পট্টিভী সীতারামাইয়ার 'The History of The Indian National Congress vol 1' এর ১৯৯ পাতায় উল্লেখ করে জানান যে সে সময় ১৮,০০০ মুসলমান মুহাজির দেশত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এস.এ. পারসিৎস্ জানান 'দেশত্যাগে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৬,০০০।'^{১৬} একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে হিজরত আন্দোলন ছিল খেলাফত আন্দোলনেরই একটা অংশ। অক্টোবর বা নভেম্বর বিপ্লবে জারের পতন ও বলশেভিকদের ক্ষমতারোহন এই আন্দোলনকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে কারণ নতুন বিপ্লবী সরকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল। আগে থেকেই এই হিজরত আন্দোলনে অংশ নিতে সোভিয়েত দেশে যাওয়া শুরু হলেও আগেই বলা হয়েছে, ১৯২০ সালেই বিপুল সংখ্যক মুহাজির ভারত-ত্যাগ করে আফগানিস্তান হয়ে সোভিয়েত দেশে উপস্থিত হন। কাজেই সোভিয়েত বিপ্লব 'ভারতের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি টেউএর অতিরিক্ত কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি' জয়জ্ঞানজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। 'সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রবাসী হবার অভিযান, যা ঘটেছিল ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এবং সর্বাধিক যা ঘটেছিল ১৯২০ সালে, তা ছিল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভারতের ওপর প্রতিফলিত ফলাফলের সবচাইতে চিত্তাকর্ষক ও দৃষ্টিনন্দন লক্ষণ'^{১৭} পারসিৎসের এ বিশ্লেষণ মিথ্যা নয়। 'প্রাচ্যের জাতিগুলোর ওপর মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল, সবার আগে পড়েছিল ভারতের ওপর।'^{১৮} জানান পারসিৎস্। তবে সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানান যে 'সোভিয়েত রাশিয়াতে যারা পাড়ি দিলেন (প্রধানতঃ সোভিয়েত তুর্কিস্তানে) তাঁদের সর্ববৃহৎ অংশ ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত জাতীয় সংগ্রামের মুসলিম অংশের প্রতিনিধি।'^{১৯} এঁদের চেতনার স্তর কোন পর্যায়ে ছিল তা জানা যায় গদর পার্টির সাবেক নেতা, দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য মহম্মদ বরকতউল্লাহর বক্তব্যে লেনিন স্বয়ং যাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ১৯১৯ সালের ৭ মে।'^{২০} তাঁর সোভিয়েত রাশিয়াতে আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে একটি লেখায় তিনি বলেন 'অনেকেই, যারা সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ-এর অর্থ কি তাও পর্যন্ত জানত না, তারাও রাশিয়াতে চলে আসে শুধুমাত্র রাশিয়ার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ও ভালবাসার কারণে।'^{২১} রাশিয়ার প্রতি তাদের এত উৎসাহ ও ভালবাসার কারণ কি? সে কারণের কথাও বরকতউল্লাহ জানিয়েছেন। কারণ 'তারা জেনেছে যে রাশিয়া হল তুরস্ক ও ভারতের বন্ধু।'^{২২} তাই পারসিৎস সিদ্ধান্ত দেন যে 'ভারতের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ পর্যন্ত ১৯১৭ সালের ঠিক ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতেও অক্টোবর বিপ্লবের সামগ্রিক কর্মসূচী উপলব্ধি করতে পারেন নি।'^{২৩} তাঁর কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে 'অক্টোবর বিপ্লব সর্বোপরি ও সর্বাধিক পরিমাণে তার গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর অংশটুকু দিয়ে, কমিউনিষ্ট অংশটুকু দিয়ে নয়-ভারতকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।'^{২৪} সে সময় সেই দেশত্যাগ আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়ে এদেশের অনেক মুহাজিরকে সোভিয়েত দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন এমন অনেকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পারসিৎস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সেই সময় খেলাফত আন্দোলনের অংশ হিসেবে যারা সোভিয়েত দেশে হিজরত করেছিলেন,

তাদের চেতনার মান ছিল ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক। যেমন উসমানী এম এন রায়ের কাছে এক পত্রে লিখেছেন যে 'যে ৩৬ জনের গ্রুপ নিয়ে তিনি তাসখান্দে এসেছেন' তারা সবাইই নিরক্ষর, তাদের নিজস্ব কোন মতামত ছিল না বরং তারা ছিল ফ্যানাটিসিজম ও ধর্মীয় মতবাদে আত্মনিরত।^{১৫} যে সব ভারতীয় মুসলমান বুখারায় পৌঁছেছিলেন তাদের নেতা আবু বরর জান বলাছেন যে ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে যা সব চাইতে বিবেচ্য বিষয় তাহল 'বুখারার সরকার হল ইসলামিক'।^{১৬} ভারতীয় বিপ্লবী সংগঠনের প্রথম সেক্রেটারী আমীন ফারুখ ১৯২১ সালের প্রথম দিকে মস্কোতে আসেন এবং সোভিয়েত রাজধানীর অভিনবত্ব দেখে নিরুৎসাহিত হয়ে লেখেন 'মস্কোতে জীবন এক রকম দুঃসহ; কোন বাজার নেই, কোন দোকান-পাট নেই, সবকিছুই রাষ্ট্রের অধিকারে, এখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, সম্পত্তি রাখবার অধিকারও নেই।'^{১৭}

মনুখ গুপ্ত বলেন 'ধর্মীয় জড়তা থেকে কাউকে কাটিয়ে আনা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য কারণ সেটাকে ভিত্তি করে প্রাচ্যের সকল দেশের জাতীয় আন্দোলন গড়ছিল ও গড়া হচ্ছিল।'^{১৮} তিনি আরো বলেন 'ভারতীয় বিপ্লবীগণ রুশ বিপ্লবকেও বিপ্লবজাত অন্য সবকিছুকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছিল কিন্তু রুশ বিপ্লবে প্রেরণা সঞ্চরী মার্কসবাদী দর্শনকে স্পর্শ করতে অনিচ্ছুক ছিল।'^{১৯} তাই পারসিৎস সিদ্ধান্ত দেন যে 'ভারতীয় প্রবাসীগণ তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন-তাদের দিক থেকে এর অন্যথা অবশ্য সম্ভব ছিল না-যে সব কুসংস্কার, যা শত শত বছরের বর্ণবাদে বিধ্বস্ত প্রথা এবং ধর্মীয় মতান্ধতাজনিত কারণে সৃষ্ট।'^{২০} ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল অর্ধি চীন, কোরিয়া, ভারত, ইরান ও তুরস্কের কমপক্ষে দশ লক্ষ নাগরিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে অবস্থান করছিল এবং ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির মত অন্যান্য দেশের প্রবাসী নাগরিকবৃন্দ সেদেশের প্রবাসী কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলেন। ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে তেহরানে গোপন ইরানী কমিউনিষ্ট পার্টির একটি বিধিতে বলা হয় যে 'যে কেউ পার্টি সদস্যপদের জন্য আবেদন করবে তাকে ১০ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত শিক্ষানবীশ থাকতে হবে' এবং পূর্ণ সদস্যপদ লাভের আগে তাকে পবিত্র কোরান নিয়ে শপথ করতে হবে পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য।'^{২১} অক্টোবর বিপ্লবের পর ইসলাম ও কোরানের ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের প্রবাসী মুসলিম নেতৃবৃন্দ বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েত বিপ্লবকে সমর্থন জানান, এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁরা ১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকেই পবিত্র কোরানে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা শুরু করেন। আবদুল কাদির তাঁর 'ইসলাম ধর্ম ও বলশেভিক কর্মসূচী' পুস্তিকায় লেখেন 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের দিকে অগ্রসর হবার সোজা রাস্তা হল ইসলাম। কেননা (ক) ইসলাম ধর্ম সকলকে সমান হিসেবে গণ্য করে; (খ) ইসলাম শত্রুতা, হিংসা ও শৈব্রতন্ত্র দূরীভূত করে; (গ) ইসলাম গোটা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ইত্যাদি' বলার পর তিনি এভাবে সমাপ্তি টেনেছেন। 'এই মতবাদ থেকেই বলশেভিজমের উৎপত্তি ঘটেছে।'^{২২} সৌকত উসমানী যিনি জাতীয়তাবাদ থেকে কমিউনিজমে চলে আসেন তিনি ২২ সালের ২০ জুন এম. এন. রায়কে লেখেন 'ইসলাম কমিউনিজমের মত সাম্যের কথা প্রচার করে। সেজন্যই আমি একজন কমিউনিষ্ট।'^{২৩}

সাহিত্যিকী

ধর্মীয় গোড়ামিকে বুকে ধারণ করে এভাবে অনেকেই সেদিন প্রবাসী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। মহম্মদ ইকবাল, বরকতউল্লাহ, আব্দুর বার্ক, তুরস্কের মুস্তাফা নাকিরের মত আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। ইসলাম ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যকার সাযুজ্যের ধারণা, যার ভিত্তি হল পবিত্র কোরানের বাণী 'সবাই সমান' এবং নীতিমালা, অক্টোবর বিপ্লবের বেশ আগেই প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচ্যের জাতীয় বিপ্লবী ও বিপ্লবী গণতন্ত্রী কর্মীদের তরফ থেকে ঐ ধরনের যুক্তির প্রবর্তনা ছিল সার্বজনীন। এরা তৎকালীন ধর্মীয় উদ্ভাদনা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি। পবিত্র কোরানের এধরনের সাম্যবাদী মূল্যায়ন অনেকের ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্যভাবে বরকতউল্লাহ এবং আব্দুর রব বার্কের ক্ষেত্রে ছিল লক্ষণীয়।

যাঁরা দ্রুত প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রবক্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলী, আবদুল মজিদ এবং মহম্মদ শফিক নেতৃস্থানীয়। ১৯২০ সালে এম. শালম্যান লক্ষ্য করেন মহম্মদ শফিক বেশ দ্রুতই কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণে সক্ষম হন। শালম্যান লেখেন 'একজন যুবক ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শফিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যিনি অন্তর্ভুক্ত, দু'মাস আগে পর্যন্ত ছিলেন কমিউনিষ্টদের চরম শত্রু; কিন্তু এখন তিনি নিজে একজন কমিউনিষ্ট হয়েছেন।'^{১৪} মহম্মদ আলী ও মহম্মদ শফিকের মার্কসবাদী প্রশিক্ষণের মান এবং একই সঙ্গে ভারতের বিপ্লব সম্পর্কিত সমস্যাবলীতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত মূল্যায়ন করেছিলেন রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রেনিপোটেনশিয়ারী প্রতিনিধি ফিওদর রাসকলনিকভ ১৯২১ এর শেষে কিংবা ১৯২২ এর প্রথমে। তিনি বলেন 'আমাদের দু'ভারতীয় বন্ধুর প্রধান ত্রুটি ছিল ভারতীয় বিপ্লবের প্রতি তাঁদের উপরভাষা এবং উগ্র-কমিউনিষ্টবাদী মনোভাব; তাঁদের মৌলিক মার্কসবাদী বোঝাপড়ার অভাব ছিল এবং শ্রেণীও অর্থনৈতিক সম্পর্কের গভীরে প্রোথিত বিষয় বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।'^{১৫} এম. এন. রায় নিজে জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে তাঁর উত্তরণে যে মূল্যায়ন রেখেছেন, তার সঙ্গে ফিওদর রাসকলনিকভ কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় এই যুব-কমিউনিষ্টদের উত্তরণ সম্পর্কিত ভাষ্য বেশ মিলে যায়। উভয়ক্ষেত্রেই ছিল যে সমবৈশিষ্ট্য তাহল পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মত থেকে শুরু করে কমিউনিষ্ট দিগদর্শনের দিকে অগ্রসর হতে থাকা।'^{১৬} তবে যুক্তিসঙ্গত যে, সেই প্রথম দিকের কমিউনিষ্টদের উল্লেখযোগ্য অংশ সম্ভবত বড় অংশই, জাতীয় বিপ্লবী ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে-সে ভারতেই হোক কিংবা অন্যান্য প্রাচ্য দেশেই হোক।'^{১৭} তাদের ভিতরে গড়ে ওঠা গোপন জাতীয় বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য থাকার কারণে মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক বিপ্লবী সাথে করে আনেন গভীরে প্রোথিত ধর্মীয় অনুভূতির এবং ফেলে আসা পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কিছু উপাদান।'^{১৮} কমরেড মুজফ্ফর আহমদের বয়ানেও এর সমর্থন মেলে। ধর্মীয় উদ্ভাদনা নিয়ে তুরস্কের খেলাফত রক্ষার্থে যাঁরা দেশত্যাগ করেছিলেন, সেই 'মুহাজিররাই তাশকন্দের মিলিটারী স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। মিলিটারী স্কুল উঠে যাওয়ার

পরে তাঁরাই আবার মক্কাতে গিয়ে 'শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেছেন। তাশবন্দে ও মক্কাতে তাঁরাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।^{৭৯} পারসিৎস্ মনে করেন অন্য রকম হবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ তাঁর মতে 'যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে ভারতীয় এবং অন্যান্য জাতীয় বিপ্লবীরা গড়ে উঠেছেন এবং জীবন কাটিয়েছেন, তা মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষার সঠিক উপলব্ধি এবং দ্রুত আত্মহ্রস্বের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় ও প্রভূত বিষয়বস্তু তাদেরকে দিতে পারে না।'^{৮০} পারসিৎস্ আরো বলেন 'মার্কসবাদের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণকারী প্রাচ্যের বিপ্লবীগণ ঐতিহ্যমত ধর্মীয় অনুভূতি কাটিয়ে উঠতে বিশেষভাবেই অসুবিধা বোধ করেন এবং সে কারণেই হয়ত তারা তাকে অতিক্রম করেন প্রায়শঃই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পথে'। তাহল 'ধর্মীয় আধারে মার্কসবাদকে গ্রহণ করা অথবা তাদের বিশ্বাস, প্রধানতঃ ইসলামকে সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে।'^{৮১} মার্কসবাদী সাম্যবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পারসিৎস্ এভাবে মূল্যায়ন করেন 'ইসলামের এ-ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, স্বভাবতই যার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই, কিছু ধর্মপ্রাণ বিপ্লবীর দৃঢ়তাকে প্রেরণা জোগায়, যা তাদেরকে এবং বিশেষভাবে তাদের অনুগামী শ্রমজীবী মানুষদের মার্কসবাদের দিকে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগীতা স্থাপনের পথে পা বাড়াতে সহজতর করে তোলে। এ অর্থে পদত ব্যাখ্যার কিছু সন্দর্ভক ফলাফল আছে।.....অবশ্য এটাও বেন্তে ভুলতে পারে না যে, ইসলামের ঐ একই ব্যাখ্যা প্রতিদ্বন্দ্বীশীল শক্তিশালীও কাজে লাগিয়েছে।'^{৮২}

আমরা জানি সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী তাশবন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। পরে ১৯২৯ সালে তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্যান্য সংগঠন হতে বহিস্কৃত হয়েছিলেন।^{৮৩} প্রবাসে প্রথম ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের কৃতিত্ব যেমন এম.এন. রায়ের, তেমনি পার্টি থেকে বহিস্কৃত হবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ ছিল। কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে লেনিন উত্থাপিত 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে প্রাথমিক খসড়া থিসিসের সঙ্গে' এম.এন.রায়ের থিসিসটি আলোচিত হওয়ায় সেদিন রায়ের স্থান ছিল এভারেট শিখরে। মানবেন্দ্রনাথ রায়কে (১৯৮৯-১৯৫৪) সঠিকভাবে প্রথম ভারতীয় কমিউনিষ্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯২০ সালের মে অথবা জুন মাসে মক্কা এসে পৌঁছান। তাই রায় সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমার মনে হয়। তিনি পশ্চিম বাংলার একটি গোপন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। একজন কড়া জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী যুবক রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯১৫ সালে অনুশীলন সমিতি তাঁকে অস্ত্র-সংগ্রহ এবং সেগুলি ভারতে নিয়ে আসার জন্য প্রশান্ত

সাহিত্যিকী

মহাসাগরিয় দ্বীপগুলিতে এক দীর্ঘকালীন সফরে জন্য পাঠিয়ে দেয়। রায় জাভা, কোরিয়া, জাপান ও চীনে যান। 'বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী দূত' হিসেবে রায় ১৯১৬ সালে আমেরিকায় যান। এখানেই তিনি প্রথম মার্কসবাদের রচনাবলী পাঠ করতে শুরু করেন। ফলে তাঁর কথায় তিনি 'সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেন, তার বহুবাদী দর্শনকে বাদ দিয়েই।'^{৭৪} রায় তাঁর স্মৃতিচারণায় জানান যে 'সমাজতন্ত্র আমাকে আকৃষ্ট করেছে তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক তাৎপর্য দিয়ে।' তাই তিনি কড়া জাতীয়তাবাদ থেকে হঠাৎ এক ঝাপ দিয়ে কমিউনিজমে উঠে আসেন।' তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ থেকে কমিউনিজমকে পৌছানোর রাস্তাটি ছিল সংক্ষিপ্ত।'^{৭৫} এটা কেবল সবচেয়ে শিক্ষিত মার্কসবাদী এম.এন. রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাই নয়, এটাই ছিল সোভিয়েত বিপ্লবের পর সেনদেশে জড়ো হওয়া প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের এক সাধারণ প্রবণতা। পারসিৎস বলেন 'ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবীরা সাধারণভাবে যে পথে মার্কসবাদের দিকে অগ্রসর হন, সেপথ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পথের মাধ্যমে ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে আদৌ তাঁদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। তাঁদের অনেকেই তখনও পর্যন্ত এ আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রকৃত উপাদান ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সোভিয়েত ব্যবস্থার সরকারের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি-যার উৎস হল এ সরকারের বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন উপনিবেশবিরোধী শক্তিতে পরিণত হওয়া এবং প্রাচ্যের জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সহায়তা দানের ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।'^{৭৬} এরা দ্রুত মার্কসবাদকে গ্রহণ করলো, কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদানও করলো, কিন্তু এত দ্রুত তাঁদের জাতীয় বিপ্লবীদের আদর্শগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটল না। সেই জন্য পারসিৎস লক্ষ্য করেন 'বহু সংখ্যক ভারতীয় বিপ্লবী নিজেদেরকে কমিউনিষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাঁরা অতীতের পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদের ধ্যানধারণার প্রতি বেশ কিছুটা আসক্ত ছিলেন।'^{৭৭} একথা এম. এন. রায় তাঁর স্মৃতিকথায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন বলে পারসিৎস লিখেছেন 'সাংস্কৃতিক দিক থেকে (তিনি) তখনও একজন জাতীয়তাবাদীই ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ হল একটি কুসংস্কার যার অবলুপ্তি সহজে ঘটে না।'^{৭৮} তিনি আরও জানান 'পরবর্তীতে যেমন বুঝলাম যে দ্রুত অগ্রগতিটা ছিল উপরভাস।'^{৭৯} তাই পারসিৎস বলেন 'প্রথম যুগের ভারতীয় কমিউনিষ্টদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত মার্কসবাদী হিসেবে যদিও এম.এন. রায়ের প্রথম প্রথম সুনাম ছিল, তবুও তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের প্রকৃত উপলব্ধি থেকে অনেক দূরেই ছিলেন। প্রাচ্যের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 'বামপন্থার শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার' তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্দিষ্ট প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান।'^{৮০} মুজফ্ফর আহমদ তাঁর বইতে রায়ের স্মৃতিকথা থেকে যেটুকু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন সেখানেও রায় বলেছেন যে 'মুহাজিরদের ভিতর শিক্ষিতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের নিয়েই কাজ শুরু হয়েছিল।'^{৮১} স্মৃতিকথায় রায় লিখেছেন 'Most of them (মুহাজির) Transferred their fanatical allegiance from

Islam to Communism. ^{১২} প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত এম.এন.রায়েই যখন এই মানসিক গড়ন, তখন সেইসব প্রায় অশিক্ষিত, গোড়া, ধর্মোদ্ধারের কথা কম বলাই ভাল। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মার্ক্সবাদী বই প্রথম ক্রয় করেন। তার আগে তিনি কোনো মার্ক্সবাদী সাহিত্য পড়েন নি বলে জানিয়েছেন। ^{১৩} নজরুলের লেখার 'মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদের স্পর্শ থাকলেও' সুশীলবাবু 'সেগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদদের উদ্ভাপই বেশী' লক্ষ্য করেন। কথাটা একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। ^{১৪}

তিন

এবারে আমরা আসল কথায় ফিরে আসি। মুজাফ্ফর আহমদ ও সুশীলকুমার গুপ্তের লেখায় নজরুল ইসলামের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাবের যে মাত্রাগত পার্থক্য রচিত হয়েছে তাদের বক্তব্যে, সে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরবার জন্য আমি এতক্ষণ অক্টোবর বিপ্লবের পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সে বিপ্লবে অংশগ্রহণ, প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের তৎপরতা এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিসহ প্রবাসীদের চেতনাগত একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করলাম। সেই আলোকে সোভিয়েত বিপ্লব বাকী নজরুল ইসলামের ওপর কতটা প্রভাব ফেলেতে পারে বা তিনি কতদূর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা উজ্জীবিত হতে পারেন, তার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মুজাফ্ফর আহমদ বলেছেন 'রুশ বিপ্লব ও লালকোঁজের প্রতি বাকী নজরুল ইসলামের একটা আকর্ষণ জন্মেছিল- সোভিয়েত বিপ্লবে নজরুল আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে, সুশীলগুপ্ত বলেছেন যেহেতু নজরুল মার্কসীয় তত্ত্ব কখনও ভালভাবে পড়েন নি, সেই কারণে নজরুলকে কমিউনিষ্ট বলা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তবে সুশীল বাবু স্বীকার করেছেন যে রুশ বিপ্লবের সাফল্যমণ্ডিত ঘটনাবলী তাঁর কবি মানসকে উদ্দীপ্ত করেছিল। মুজাফ্ফর আহমদ তাঁর নজরুল স্মৃতিকথায় কোথাও নজরুলকে কমিউনিষ্ট বলে অখ্যায়িত করেছেন, এমনটা আমার চোখে পড়েনি। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে সুশীল বাবুর বইটি মুজাফ্ফর আহমদের নজরুল স্মৃতিকথার রচনার প্রায় পাঁচ বছর আগের লেখা। ১৯৬৫ সালে মুজাফ্ফর আহমদই এই বিতর্কের সূত্রপাত করেন। মুজাফ্ফর কখনও নজরুলকে কমিউনিষ্ট বলেন নি। তাই নজরুল ইসলাম যে কমিউনিষ্ট ছিলেন না, সুশীল গুপ্তের এই বক্তব্য যদি আমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য হয়, তাহলে মুজাফ্ফরের সঙ্গে সুশীলগুপ্তের এই বিতর্কের আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? দু'জনের বক্তব্যে পার্থক্য কোথায়? রুশ বিপ্লব যে নজরুলের কাব্য মানসকে উদ্দীপ্ত করেছিল, একথাতো মুজাফ্ফর আহমদের মত সুশীলগুপ্তও স্বীকার করেছেন। সেইজন্যে ডঃ গুপ্ত বলেন যে নজরুলের পক্ষে 'সাম্যবাদী' 'সর্বহারা' কবিতাগ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছিল। তাহলে সুশীল গুপ্তের সঙ্গে মুজাফ্ফরের পার্থক্যটা কোথায়? পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে জন্মসূত্রে মানুষ যেমন একটি ধর্মীয় চিন্তা প্রাপ্ত হয়, মার্ক্সবাদ

সাহিত্যিকী

তেমন কোন ধর্মীয় বিশ্বাস নয় যে বাবা মা কমিউনিষ্ট হলে পুত্র কন্যা অনিবার্যভাবে কমিউনিষ্ট হবেই। তাই 'মার্কসীয় তত্ত্ব ভালভাবে আয়ত্ত না করলে সত্যিকার কমিউনিষ্ট হওয়া যায় না' সুশীল বাবু তো মিথ্যে বলেন নি। আহমদ শরীফও সুশীল গুপ্তের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন এভাবে। 'দেশকালের প্রভাবে সাম্যবাদে (নজরুলের-লেখক) অনুরাগ জাগায় যদিও সাম্যবাদের মর্ম ও মূল্য কোনটি তাঁর সম্যক অধিগত ছিল না বা জানবার বুঝবার চেষ্টাও ছিল না কখনো' তবুও তিনি উচ্চকণ্ঠে উদাত্তস্বরে দ্রোহের বিপ্লবের সংগ্রামের বাণী অবিরাম উচ্চারণ করেছেন বার বছর ধরে।^{১৫} দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আবারও বলি এম.এন. রায়ের মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি প্রবাসে প্রথম ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলেছিলেন, তিনি কত 'ভালভাবে' মার্কসীয় তত্ত্ব পড়েছিলেন, তা আমার জানা নেই। তবুও এ সত্যটি তো পরিস্কার হয়েছে যে তিনিও 'সত্যিকার' কমিউনিষ্ট হতে পারেন নি বলেই ১৯২৯ সালে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। মুজাফ্ফর আহমদ ও সুশীল গুপ্ত কেউই কাজী নজরুলের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন নি। তাহলে মুজাফ্ফর আহমদ তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ নজরুল-জীবনীকার ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করলেন কেন? উভয়ের চিন্তার পার্থক্যটি কোথায়? আমার মনে হয় তাঁরা উভয়েই বড় যে ভুলটি করেছেন তাহল তাঁরা তাঁদের মেধা, মনন ও বুদ্ধি দিয়ে নজরুলকে বিচার করতে বসেছেন। একজন প্রায় অশিক্ষিত সৃজনশীল প্রতিভাকে যে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা কতটা অসম্ভব তা যে কোন সৃজনশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে সুশীল বাবু তাঁর ভুলটা কিছুটা হলেও শোধরাবার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে 'নজরুলের সাম্যবাদ তাঁর অন্তরেরই প্রেরণালব্ধ জিনিস ও নিজস্ব কবি কল্পনার রঙ্গ রঙিন।' শুধু কবিতায় নয়, তিনি তাঁর অনেক গদ্য লেখায়ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে সরাসরি সাম্যবাদ, কার্ল-মার্কস, ক্যাপিট্যালের উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে মার্কসবাদ তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল নিজে মার্কস না পড়লেও। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র 'আত্মশক্তির' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপাল লাল সান্যালকে লেখা তাঁর চিঠির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যায়। 'যে কোন দেশের কোন শ্রমিক কার্লমার্কসের ক্যাপিট্যাল পড়ে বুঝতে পারবে না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে, তারা কৃষক-শ্রমিক নয়, তারা লেনিন, ল্যাসব্যারীর নমুনার লোক। কার্লমার্কসের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে, যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোন কালেই জনসাধারণ বুঝবে না। মতবাদ তৈরী করে তুলবে সেই রকম লোক যারা বুঝাবেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়ীতে চড়বে জনসাধারণ।'^{১৬} 'যুগবাণীর' অধিকাংশ প্রবন্ধে নজরুল মানুষের জয়গান গেয়েছেন। তিনি যে মানুষকে তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়েছেন 'যুগবাণীর' ঐসব প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে তা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন। 'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধে হিন্দুদের 'ছুৎমার্গকে' যেমন কঠিন ভাষায় কষাঘাৎ

করেছেন, সেই সঙ্গে তিনি মানবধর্মের জয়কীর্তনও করেছেন। তিনি সবাইকে আহ্বান করেন ‘মানবতার এই মহাযুগে একবার গভী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল সে তুমি ব্রাহ্মণ নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ-তুমি সত্য।’^{১৭} আসল কথাই বলেছেন সুশীল বাবু। সাম্যবাদ নজরুলের অন্তরের প্রেরণালব্ধ জিনিস। সে প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেলেন সে কথায় পরে আসছি। এখানে এটুকু বলে রাখি লেখাপড়ার মাধ্যমে তিনি সে প্রেরণা পান নি। নজরুল ইসলাম মূলত Anti-intellectual। কারণ তিনি নিজেই সৃষ্টিকর্তা। একথা মুজফ্ফর আহমদ আমাদের জানান ‘নজরুল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন।’^{১৮} অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগেও’ সে কথার সত্যতা খুঁজে পাই। অল্প কিছু দিনের জন্য হলেও কবি মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের অভিভাবক সাজেছিলেন। ১৯২০ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত।^{১৯} মুজাফ্ফর বলেছেন ‘মোহিতলাল শুধু যে নজরুলের অভিভাবক হয়ে বসতে চেয়েছিলেন তা নয়, তিনি তাঁকে গড়েও তুলতে চেয়েছিলেন; অবশ্য তাঁর নিজের আকৃতিতে।’^{২০} কল্লোলযুগে অচিন্ত্য লিখেছেন, ‘নজরুলের গুরু ছিলেন এই মোহিতলাল।.....নিজের পরিবেষ্টনের মধ্যে নিয়ে এলেন নজরুলকে। বললেন ‘পড়ো শেলি-বীটস্, পড়ো বাইয়ন আর ব্রাউনিং। দেখ কে কি লিখেছে, কিভাবে লিখেছে; মনে হৈর্ষ আনো, হও নিজে নিজের সমালোচক, কল্পনার সোনার রঙে চিত্তার সোহাগ মেশাও।’^{২১} এখানেই ভুল করেছিলেন মোহিতলাল। সেকথা মুজফ্ফর আহমদও তাঁর বইতে লিখেছেন ‘মোহিতলাল যখন ইংরেজ কবিদের বড় বড় কাব্য নজরুলের সঙ্গে বসে পড়তে চাইলেন তখনই তিনি করলেন ভুল।.....এখানে তিনি কবি নন্, ক্যালকাটা হাইস্কুলের হেডমাস্টার।’^{২২} মোহিতলাল মজুমদারের সে উপদেশ গায়ে মাখে না নজরুল। অচিন্ত্যকুমার জানান ‘দে গরুর খাইয়ে ধুইয়ে’- নজরুল খোরাই কেয়ার করে লেখাপড়া। মনের আনন্দে লিখে যাবে সে অনর্গল, পড়বার বা বিচার করবার তাঁর সময় কই। হেয়ালী সৃষ্টিকর্তা মনের আনন্দে তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র, পড়ুয়া জ্যোতিষীরা তার পর্যালোচনা করুক। সেও সৃষ্টিকর্তা।’^{২৩} একজন সৃষ্টিকর্তা কি জন্মে বা কিভাবে সৃষ্টি করেন, তা আমরা যারা মেধা, মনন ও বুদ্ধির কারবারী তারা কল্পনাবিলাসী হতে পারি মাত্র, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার মনের কাছাকাছি কতটা পৌছাতে পারি, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নজরুল মার্কসীয় দর্শন পড়ে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, একথার পিছনে তেমন কোন প্রমাণ হাজির করা যায় না। তবুও একথা সত্যি যে নজরুলের মধ্যে যে সাম্যবাদী চেতনা ও মানবধর্মের প্রতি তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে তা অক্টোবর বিপ্লবের পর পরই বেগবান হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে অক্টোবর বিপ্লবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ে সারাবিশ্বের গতরখাটা নিম্নস্তরের মানুষ উজ্জীবিত হয়েছিল। নজরুলও সমাজের নীচস্তর থেকেই এসেছেন। তাঁর মধ্যে শ্রমজীবী

সাহিত্যিকী

মানুষের বিজয়ে উজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই নামগোত্রহীন সাধারণ মানুষের কাতারে নজরুলকে অন্তর্ভুক্ত করলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। সাধারণ মানুষ তো 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' শ্রেণীর কবিতা লেখে নি। তাই একথা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে যে কেবল অক্টোবর বিপ্লবই নজরুলকে সাম্যবাদের পথে টেনে এনেছিল। তাই এ প্রশ্নকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না সাম্যবাদ ও মানবধর্মের সার নজরুল কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? আসাম্যবাদীসমাজের শক্ত জমির ভিতর থেকেই সে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাম্যবাদী চেতনার উৎসারন ঘটেছিল ইতিহাস পাঠে সে কথা জানা যায়। মার্ক্সবাদও সে কথায় সায দেয়। হয়তো মার্ক্সীয় সাম্যবাদের মত তখন তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। সমাজ ও নৃবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন নামে তাকে আলাদা করেছেন। 'স্বতঃ স্ফূর্ত সাম্যবাদ', 'কল্লস্বর্গ সাম্যবাদ' ইত্যাদি। কিন্তু একথা সত্যি মার্ক্সের আগেও যেকোন কর্মে হোক, সাম্যবাদী চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া নজরুলের শ্রেণী অবস্থান ও নিদারুণ দারিদ্র যদি তাঁকে সাম্যবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। সুশীল বাবু তাঁর বইতে লিখেছেন 'নজরুলের জীবনকে সম্যকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে তাঁর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাবাবর্ত আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করেছে। সত্যকার প্রতিভা ছাড়া এই সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। কথাটা খুবই সত্যি। আহমদ শরীফ কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলেছেন 'অক্টোবর বিপ্লবের পর সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে যে নতুন স্বপ্নে, আশায় ও উদ্দীপনায় সাহসী ও উদ্যোগী করে তুলেছিল' 'কোলকাতায় নজরুল ইসলামও পেয়েছিলেন এমন মানস প্রতিবেশ কিছুটা, যদিও যুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিক ইতিহাসে প্রত্যক্ষ বিচরণের স্বল্পতার কিংবা অভাবের ফলে বিশ্বাস সংস্কারের ভুতড়ে উপদ্রব থেকে তাঁর মন বুদ্ধি বিবেক কখনো মুক্তি পায় নি।' 'কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। তবে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্তকে তিনি দ্বিতীয় স্তর বলছেন।^{৭৬} বিদ্রোহী কবিতা ১৩২৮ কার্তিকে ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'মোসলেম ভারতে' এ বাহির হইয়াছিল।^{৭৭} মুজফ্ফর আহমদ দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন '১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী (মুতাবিক ২২শে পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে, শুক্রবার 'বিদ্রোহী' বিজলীতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল।'^{৭৮} আর যে 'ব্যথার দান' গল্পে মুজফ্ফর আহমদ নজরুলের মধ্যে লালফৌজ ও সাম্যবাদের প্রভাব দেখতে পান, সেটি ছাপা হয়েছিল ১৯১৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে। কাজেই ওদুদের এই কালপর্বও নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। তাঁর মতে দ্বিতীয় পর্বই তাঁর সাম্যবাদের কাল। তাহলে 'ব্যথার দান' গল্পে সাম্যবাদের ধারণা এল কোথা থেকে? তাছাড়া কাজী ওদুদ নিজেই স্বীকার করেছেন 'বিদ্রোহী' প্রকাশের বেশ ক'বছর আগে ১৯১৯ সালে নজরুল কলকাতায় সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হন তখনই এক হিসেবে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী।'^{৭৯} যাহোক, নজরুলের সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে একটা বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। সবল নজরুল গবেষক ও জীবনীকার একথা

স্বীকার করেন যে নানাদিক থেকে নানাভাবে এসে স্থান সে খুর করে নিয়েছিল নজরুলের মনোজগতে। সেসব ভাব-সম্পদের মধ্যে যে কোন শৃঙ্খলার অভাবই পরিলক্ষিত হয় তা নয়, পরস্পর বিরোধী ভাবধারাও নজরুল মানসের এক বৈশিষ্ট্য।

তবে নজরুল ইসলামের গান-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-চিঠিপত্র এককথায় সমগ্র নজরুল সাহিত্য পড়লে সেসব ভাবের মধ্যে দু'টি ভাবকে আলাদা করে সনাক্ত করা যায়। প্রথম, সমাজের নানাবিধ বৈষম্যের প্রতি তাঁর তীব্র ক্ষোভ আর দ্বিতীয়টি হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর অপার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। প্রথমটি থেকে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় সাম্যবাদী চেতনা আর দ্বিতীয়টি তাঁর মধ্যে জন্ম দেয় বিশ্ব মানবধর্ম। তাঁর নিকটতম বন্ধু কমরেড মুজফ্ফর আহমদের প্রভাব নজরুলের ওপর পড়েছিল, একথা হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে অনেকেই মনে করেন, কাজী ওদুদও মনে করেন, মুজফ্ফর প্রভাবে নজরুল সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছিলেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের ঐতিহাসিক কারণ মুজফ্ফর আহমদই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মুজফ্ফর আহমদ নজরুল স্মৃতিকথায় আমাদের জানান যে '৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়ার অল্প কিছুদিন আগে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে নজরুল সাত দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় তাঁকে পথ চিনিয়ে ৩২, কলেজট্রীটে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে নিয়ে এসেছিলেন শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।'^{৮১} সেই সময় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের প্রথম পরিচয়। তবে ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর নজরুলের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু হয়।^{৮২} আমরা আহমদের বই থেকে জানতে পারি যে ফৌজ থেকে ফেরার আগেই তাঁর দু'টি গল্প 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।'^{৮৩} 'হেনা' ছাপা হয় ১৩২৬ সালের কার্তিক মাসে আর 'ব্যথার দান' ঐ বছরেরই মাঘ সংখ্যায়। ইংরেজি বছর মতে ১৯১৯ সালে। যেহেতু ঐ দু'টি গল্পে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ নিজেই নজরুলের মধ্যে রুশ বিপ্লব ও লালফৌজের প্রতি আকর্ষণের কথা জানতে পারেন, তাই এটা স্বতঃসিদ্ধান্তভাবে সত্য যে কমরেড মুজফ্ফরের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই নজরুল ইসলাম 'রুশ বিপ্লব' ও 'লালফৌজের' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে কাজী নজরুল ইসলামের ওপর সাম্যবাদ ও মানবধর্মের প্রভাব এল কোনাথ থেকে? আগেই বলেছি সাম্যবাদের ধারণা পৃথিবীতে নতুন কোন ধারণা নয় অসাম্যের শক্ত মাটি থেকে সে ধারণার জন্ম হয়েছিল মার্কস কর্তৃক সূত্রাবদ্ধ হবার অনেক আগেও নজরুলের শ্রেণী অবস্থানই তাঁকে সাম্যবাদী চেতনার নিকটবর্তী করে। ছোট থেকেই তিনি চরম দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অত্যন্ত কাছে থেকে দারিদ্রের ভয়বহতা উপলব্ধি করেছেন। আহমদ শরীফের ভাষায় 'দেশকালের প্রভাবে (তাঁর-লেখক) সাম্যবাদে অনুরাগ জন্মায়।'^{৮৪} তাছাড়া শিয়ারশোল স্কুলে নজরুলের শিক্ষক শ্রীনিবারন চন্দ্র ঘটক 'যুগান্তর' নামের ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯১৭ সালে তিনি ও শ্রীযুক্তা দু'কড়িবালা যথাক্রমে ৫ ও ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। নজরুল মুজফ্ফরের কাছে স্বীকার করেছিলেন বলে জানা যায় যে তিনি শ্রীঘটকের দ্বারা তাঁর মতবাদের দিকে আকর্ষিত হয়েছিলেন।^{৮৫} বঙ্গভঙ্গের পর থেকে এদেশের একজন যুবকের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী

সাহিত্যিকী

আন্দোলনে যুক্ত হওয়া যতটা সহজ ব্যাপার ছিল, মার্কসবাদী সাম্যবাদের ধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়া ততটা সহজসাধ্য ছিল না। কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে ক্রীড়াশীল মানবধর্মের উৎসের সন্ধান করলে দেখা যাবে তৎপূর্ববর্তী হাজার বছরের বাংলার সমন্বয়ধর্মী লোকসংস্কৃতির মধ্যে তার মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। আজ সবাই স্বীকার করেন লোক-সংস্কৃতি যেকোন দেশের মূল ভাবসম্পদ। প্রতিটি দেশের নিজস্ব জল-বায়ু-মাটিই তার উৎসভূমি। লোকসংস্কৃতির কোন ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, রঙ নেই। জাত-পাতহীন লোকসংস্কৃতি চরিত্রের দিব্য থেকে অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ। প্রতিটি দেশের লোকসংস্কৃতি জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে সবার ওপরে স্থান দেয়। এই লোক সংস্কৃতির শক্তি প্রচণ্ড। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় এর রূপ পরিবর্তন হলেও এর বিনাশ নেই। এর শক্তির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন বিনয় ঘোষ তাঁর 'লোক সংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে।^{৮৬} ঘোষ বলেন 'বিচিত্রগামী রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় কতদিক থেকে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির কত পবাহ এসে যে মিলিত হয়েছে, তার ঠিক নাই।'^{৮৭} যৌবনের গোড়া থেকেই দেখা যায় স্বদেশের প্রাকৃত জনের ভাব ও ভাষার কীর্তি ও কাহিনীর স্পর্শলাভের জন্য রবীন্দ্রনাথের মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। 'একুশ বাইশ বছরে 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামের বাউল গানের সংকলনটি আলোচনার জন্য তাঁর হাতে এলে তাঁর জীবনের সামনে এক নতুন রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে দেয়।' তিনি আলাউদ্দিনের আশ্রয় প্রদীপের সন্ধান পান।' বলেন বিনয় ঘোষ।^{৮৮} কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও কথাগুলি সত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইউরোপ যখন আধুনিক পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রাণচাঞ্চল্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই সেখানে লোক সংস্কৃতির পুণরুন্মীলনের ধারা লক্ষ্য করেন বিনয় ঘোষ।^{৮৯} লোক-সংস্কৃতির সে পুণরুন্মীলনের প্রধান উৎস ছিল 'স্বদেশানুরাগ' ও 'স্বজাত্যবোধ'। সুইডেনের লিনিয়াস (১৭০৭-৭৮) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রথম সংস্কৃতির লোকায়ত ধারার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করেন হিল্টন ক্যাভেলিয়াস (১৮১৮-৮৯) ও হেজেলিয়াস (১৮৩৩-১৯০১)। হেজেলিয়াস সুইডেনে লোক সংস্কৃতির যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন সারা পৃথিবীর Folk Musium এর মধ্যে যা আজও অদ্বিতীয়। লোক-সংস্কৃতি অনুশীলনের এই আগ্রহ ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ডে পৌছায় উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে ১৮৭৮ সালে সেখানে 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যন্ত্র-সভ্যতার কানকাটা হট্টোগোলের মধ্যে লোক-সংস্কৃতির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ই.ডবলিউ, ব্যাক্সফ এবং সিসিল শার্পের (১৮৫৯-১৯২৪) মত দুজন মহান ব্যক্তিত্ব।^{৯০} লোক সংস্কৃতির শেকড় কত গভীরে এবং তার শিরদাঁড়া কত শক্ত এ আবিষ্কার আধুনিক কালের। এর আগে এ নিয়ে মানুষকে এতচিন্তা ভাবনা করতে দেখা যায় না। স্রষ্টারা তখন সৃষ্টি করে গেছেন, আমরা এখন তা নিয়ে গবেষণা করছি।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অনেক গানে বাউলের সুর গ্রহণ করেছিলেন এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাঁর কত গানে কবিতায় লোক সংগীতের সুর ও ভাব ঢুকে পড়েছিল সে কথা তিনি নিজস্বাধে স্বীকার করেছেন।^{৯১} তাছাড়া তিনি জীবনের অনেক বছর বাউল সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া, মেয়েলী ব্রত, বাংলার ঘট-পট, চাঁটগাঁর মেয়েলি শিল্প প্রভৃতি সংগ্রহে অতিবাহিত করেছিলেন এবং সেসব সংগ্রহের জন্য অন্যকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। ১৩০১ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'মেয়েলি ছড়া নামে

প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ‘সদ্যঃ কর্ষনে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয় অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ তাহাকে পুষ্প, চন্দন গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না।’^{১২} রবীন্দ্রনাথের মত কাজী নজরুল ইসলাম সে গন্ধের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ও আদরনীয় ছিল লোক সাহিত্যের সহজ, স্বাভাবিক কাব্যরস তার আদিম সৌকুমার্য, বিচিত্র ছন্দ এবং বাউল গানের মতো লোকসঙ্গীতের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ।’^{১৩} বাউল গানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ হল সমস্ত সামাজিক সংস্কার বিধিনিষেধ ও প্রথারীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা।’ বলেন বিনয়ঘোষ।^{১৪}

মূল হতে হয় ডালের সৃজন
ডাল ধরলে পায় মূল আহরন হে।
তেমনি রূপ হতে অরূপের
তারে ভেবে রূপ,
অধীন লালন সদা
নিরূপ ধরতে চায়। (লালন)

১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের অন্তর্নিহিত মর্ম তুলে ধরে বলেন ‘It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the temple or scriptures in images and symbols. ‘মানবাত্মার ভিতর দিয়েই পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করা সম্ভব। দেবতা মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় নেই; কাশী মক্কা জেরুজালেমেও নেই,। দেবতা আছেন মানুষের মধ্যে, জীবন সাধনার মধ্যে।’^{১৫} সেই বক্তৃতার পাঁচ বছর আগে ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর ‘লাঙ্গলের’ প্রথম বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুল ইসলামের সর্বপ্রধান সম্পদ ‘সাম্যবাদী’ কবিতা। সেখানে নজরুল যা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে পাঠক একটু মিলিয়ে নিতে পারেন।

‘তোমাতে রয়েছে সকল কেতার সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুঁজে দেখ নিজ প্রাণ।
... ..
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধ গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবাভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ইসামুসা পেল সত্যের পরিচয়।’^{১৬}(সাম্যবাদী)

এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়

‘সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয় জাতের বিরূপ দেখলাম না এ সংসারে।’

সাহিত্যিকী

নজরুলের 'জাতের বজ্জাতি' কবিতা পড়লে জাতপাত সম্পর্কে তাঁর একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জাত ছেলের হাতে মোয়া নয়।'

যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত
আজ নয় কাল ভাঙ্গবে সেত,
যাব্ না জাত জাহান্নামে রইবে মানুষ, নাই পরোয়া।^{১৭}(জাতের বজ্জাতি)

'মানুষের সাথে মানুষের যে কোন ধর্মগত, জাতিগত ও বর্ণগত পার্থক্য যে মানুষেরই সংকীর্ণ জাগতিক স্বার্থে রচিত'-এসত্য রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলও উপলব্ধি করেছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা উভয়েই তাঁদের শিল্পী জীবন ও মানবজীবনের সত্যরূপ উপলব্ধি করেছিলেন যে 'এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মার যে ঐক্য সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্য ও সত্য। তাঁরা উভয়েই এই জীবন দর্শন যে বাংলার লোকায়ত সাহিত্যের মর্মস্থল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, এ সত্য বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাঁদের উভয়ের কাছেই সম্প্রদায়গত ধর্ম, ধর্ম নয়-জীবনধর্মই হল মানবধর্ম। তাই ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ন 'ধূমকেতুতে' প্রকাশিত 'আমাদের ধর্ম' নামক ছোট্ট প্রবন্ধে নজরুল বলেন 'দেশে একটা কথা উঠেছে যে মুক্তির জন্য যে আন্দোলন চালাচ্ছি, আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে।'^{১৮} নজরুলের এটা পছন্দ নয়। তাই প্রশ্ন তোলেন 'কিসের জন্য আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে?' তিনি অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মানবধর্মই যে কবি জীবনধর্ম বলে মনে করেন সে কবি কেন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্মে বাধা পড়তে চাইবেন?

কেবল লালন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা না করে আমরা যদি আরও পিছনে যাই, তখন দেখবো যখন জাতপাতের কঠোরতায় হিন্দু জনজীবন পর্যুদস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমানবিক শাসন-শোষণে হিন্দু সমাজ যখন ক্ষতবিক্ষত, তখন এদেশে ইসলামের আগমন হিন্দু সমাজে এক ধরনের টানাটোড়নের সৃষ্টি করে। ইসলামের কল্লবর্ণ সাম্যবাদ ও একেশ্বরবাদ যখন হিন্দু সমাজের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক এক সংকটের সৃষ্টি করে, তখনই একদল সাধু-সন্ত-ফকির দরবেশ বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়ধর্মী মানবধর্ম প্রচারের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন রচনায় জীবন উৎসর্গ করেন। তার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় রামানন্দ কর্তৃক মিলিত উপাসনা সম্প্রদায়' স্থাপনের মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে। 'মিলিত উপাসনা সম্প্রদায়ের' প্রধান বক্তব্য ছিল 'ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান।' এখানে 'আল্লাহর চোখে সবাই সমান' এই মহান বাণীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন কারো চোখ এড়িয়ে যায় না। খুঁটি নাটি আচার বিচার ছেড়ে দিয়ে রামানন্দ সকল জাতের লোককে শিষ্য বলে গ্রহণ করতে লাগলেন।^{১৯} পনের শতকের মধ্যভাগে ভগবান প্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত জোলা কবীর একদিকে হিন্দু মূর্তিপূজা ও ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যদিকে কোরান ও ধর্মসংস্কারের আক্রমণ করলেন এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কঠিন ভাষা ছেড়ে নব্য চলিত ভাষায় ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন।^{২০} তারপর

নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্মঃ ফিরে দেখা

থেকে সূফীবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম, সত্যপীর বা সত্যনারায়ন, বনবিবি, গান্ধী খাঁ, দক্ষিণ রায়, বাউলধর্ম, পীরপূজা, মুর্শিদীগান ইত্যাদি ধর্ম ও ভাবান্দোলনের মাধ্যমে সারা মধ্যযুগ ধরে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু মুসলমানে মিলনের জন্য এক সমন্বয়বাদী মানবধর্ম সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। কেবল এসব ধর্ম সমন্বয়বাদী আন্দোলনই নয়, মধ্যযুগের মুসলমান শাসকবর্গও হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনে উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মিলন সেতু রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। আকবরের 'দীন-ই-ইলাহীর' কথা স্মর্তব্য। এই সমন্বয়ের ধারা যে কেবল বাংলাদেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না তার প্রমাণ এই যে চতুর্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের সূফীসন্ত শেখ নুরুদ্দীন সরাসরি বলছেন 'Do not divide Hindus and Muslims Truth is not a prisoner of mosque and Temples and is all pervading'^{১০১}

ইসলাম আগমনের পর এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাত ও সমন্বয়ের বিষয়টি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেছেন ডঃ পঞ্চানন সাহা। কেন এদেশে ভক্তিবাদের জন্ম হল এবং কি তার বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'জাতপাতের বেড়া জালে আবদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলপতিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব প্রবলভাবে পড়ল। সাধারণ মানুষ আর পুরনো ধর্মে সন্তুষ্ট থাকতে চাইল না। তাঁরা এমন এক ধর্মের জন্য উৎসুক হলেন যার মধ্যে থাকবে যুক্তি ও আবেগ উভয়েরই সংমিশ্রণ। এসবের কারণে পনের ও ষোলো শতকে উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের বন্যা বয়ে গেল। ভক্তিবাদের মূলকথা হল আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অতীন্দ্রিয় মিলন।.....আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যকার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সুশী পন্ডিতীয়ানার পরিবর্তে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রচার করেন এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা। তাঁরা বলেন জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে যেকোন মানুষ ভক্তি আর ভালবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে সক্ষম। ধর্মীয় আচার-বিচারের চেয়ে বহুগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল ঈশ্বর প্রেম। ঈশ্বরের কাছে সকল মানুষ সমান-ভক্তিবাদী আন্দোলনের এই নীতি সামাজিক সাম্যের আদর্শ, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ'^{১০২}

অরবিন্দ পোদ্দার ভারতের মধ্যযুগের ভাবাকাশের আলোচনা শেষে তিনটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান। 'প্রথমত, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং ঐক্য সংস্থাপনের প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়ত, প্রচলিত সামাজিক ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তৃতীয়ত, অখণ্ড উদার মানবতা'^{১০৩} পঞ্চানন সাহা ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পান।^{১০৪}

- (১) ভগবান এক এই ধারণা এবং সমস্ত ধর্মের সমতা আর সর্বধর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব।

সাহিত্যিকী

- (২) সব মানুষ সমান এই বোধ আর জাতিভেদ প্রহার নিন্দা। জন্মসূত্রে নয় কর্মের দ্বারা মানুষের মর্যাদা গড়ে ওঠে।
- (৩) পুরোহিত শ্রেণীর আরোপিত বিভিন্ন পূজা-অর্চনার নিন্দা।
- (৪) শুধু প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে অর্জন।

ডঃ সাহার কথার প্রতিধ্বনি শুনি অরবিন্দ পোদ্দারের কণ্ঠেও। তিনি বলেন 'হিন্দু ও মুসলিম সংস্কার-সংস্কৃতির বিধায়কগণ নিজ নিজ সমাজের ও ধর্মের সীমানা সংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। তাদের এই সংকীর্ণ-সংরক্ষণশীলতা যে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় আবর্তে আরও বেশী তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল তা অবশ্য স্বীকার্য। এই বিক্ষোভের আঘাতে সাধারণ মানুষের জীবন যে অভ্যস্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং এই বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাদের মন যে প্রতিকারহীন বেদনায় কেঁদে উঠেছিল'^{১০৫} মধ্যযুগের সমন্বয়বাদী মানবধর্ম তারই সাক্ষ্য বহন করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর রামানন্দ বুঝেছিলেন যে 'ঋষিদের নামে যদি গোত্র পরিবার হইয়া থাকে, তবে ঋষিদেরও পূজিত পরমেশ্বর ভগবানের নামে কেন সবার পরিচয় হইবে না? সেই হিসেবে সবাই তো ভাই, সবাই এক জাতি। ভক্তিদ্বারাই শ্রেষ্ঠতা, জন্ম দ্বারা নহে।'^{১০৬} রামানন্দ বলেন 'কেন ভাই আর মন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয়-মন্দিরেই তার দেখা পাইয়াছি।'^{১০৭} রামানন্দ শিষ্য জোলা কবীর বলেন-^{১০৮}

জোর খুদাই মসীত বশত হৈ ঔর মূলিক কিসকেরা ॥

তীরথ মুরতি রাম নিবাসা দুইমৈ কিন হুন হেরা ॥

পূরিব দিশা হরী বা বাসা পছিম অলহ মুবামা।

দিল হী খোজি দিলে দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা ॥

(খোদা যদি মসজিদেই বসবাস করেন তাহলে আর সব মূলুক কার? তীর্থে মূর্তিতে রামের আবাস, এই দ্বৈতভাবের মধ্যে সত্য কোথায়? পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমে আল্লাহর মোকাম, খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যেই রাম-রহীম বিরাজমান।)^{১০৯} এখানেই রাখীবন্দন ঘটে গেছে পনের বা ষোল শতকের রামানন্দ বা জোলা কবীরের সঙ্গে বিশ শতকের কাজী নজরুল ইসলামের 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নেই' (সাম্যবাদী) বা 'তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার, তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।' (সাম্যবাদী)। কি আশ্চর্য এই সানুয্য? 'সে যুগের সাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের সর্বাপেক্ষা প্রকৃত উদাহরণের উল্লেখ করছেন অরবিন্দ পোদ্দার। তাহল 'হুসেনী ব্রাহ্মণ।'^{১১০} ঐতিহাসিক তাঁরাচাদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে পঞ্চগনন সাহা কবীরের মূল লক্ষ্যের কথা আমাদের জানান 'সর্ব ধর্ম বর্ণ সমন্বয়ী প্রেমের ধর্ম প্রচার করাই ছিল কবীরের লক্ষ্য।'^{১১১}

কবীরের ন্যায় নানকও একেশ্বরবাদের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। নানক বলে 'He who looketh on all men as equal is religious.'^{১১২} যিনি সকল মানুষকে সমানভাবে দেখেন তিনিই ধার্মিক। 'প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ শুধু যারা কোরান বা শাস্ত্র বিধান মেনে চলতেন না, তাদের বেলায়ই সত্য নয়, যারা শাস্ত্রাদি মেনে চলতেন এমন বহু সাধকও প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

ক্ষতিমোহন সেন তার বিখ্যাত বইতে এমন অনেক সাধকের কথা উল্লেখ করেছেন। পন্ডিতরা পিলে এমন একজন সাধক যিনি বলেন 'হাতে গড়া পাষণে বা তেঁতুল মাজা তাম্রমূর্তিতেই ঈশ্বর নেই। তাহাকে অন্বেষণ কর হৃদয় গুহায়, সাধকের হৃদয়-স্বর্গে, মানবপ্রেমে।'^{১১৩} এই বাণীর মধ্যে মধ্যযুগের সমন্বয়ধর্মী মানবধর্মের যে মূল সুরটি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে তাহল প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্র বিরোধিতা এবং সর্বোপরি মানবপ্রেম। কয়েকশ' বছর অতিক্রান্ত হয়ে এসে সেই সুরটি শোনা গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে।

ষোল শতকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। কারণ অজানা নয়। ইসলামের উদারনৈতিক ও মানবতার আহ্বান থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য তাদের মত করে। তারফে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ বিকৃত তন্ত্র ধর্মের অভিঘাতে শতধা বিভক্ত পড়ে। সে ধর্মে তখন মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমপ্রীতির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কড়াকড়ি হিন্দু-সমাজে ঐক্য নয়, বিভেদ বিচ্ছেদের হয় বাড়-বাড়ন্ত। সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে, অর্থাৎ ইসলামের উদার মানবতাবাদী আহ্বান থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বৈষ্ণব-ধর্মের সার নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীচৈতন্য। বাংলার হিন্দু সমাজে এক বিপ্লব ঘটে গেল। শ্রীচৈতন্য তাঁর ধর্ম প্রচারে হিন্দু সমাজের জাতপাতের বেড়াকে অতিক্রম করে চড়াল এমনকি যখনকে বোল দিয়েছিল।^{১১৪} রবীন্দ্রনাথ বলেন 'সে এক শাস্ত্র ছাড়া ব্যাপার।'^{১১৫} রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন 'চৈতন্য, নামক, দাদু কবীর ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন।'^{১১৬} বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম এক বিরাট বিপ্লবী আন্দোলন। কার্যত বৈষ্ণবধর্মই একটা বিদ্রোহের ধর্ম। শ্রীচৈতন্য আপন প্রতিভাবলে ভক্তি ধর্মকে প্রেমধর্মে পরিণত করেছিলেন। তাঁর প্রেমধর্ম হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ অনুশাসিত জাতপাতের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে হিন্দু সমাজের নিচুতলায় নবজীবনের প্রবল বান ডেকে আনল। লোকে মনুষ্যত্বের স্বাদ আনন্দন করল।' বলেন পঞ্চানন সাহা।^{১১৭} তিনি আরো জানান যে 'বাংলার অনেক বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও সমাজের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।'^{১১৮} এই বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মুসলমান বংশের সন্তান হরিদাস। তাঁর জন্ম ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৩৬ বছর আগে খুলনা জেলায়। ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে তিনি তাঁর নাম রাখেন হরিদাস। এতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ রাগান্বিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে বর্জন করার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। ধর্মাত্ম মুসলমানরা হরিদাসের ধর্মাস্তকরণের বিরুদ্ধে কাজীর বিচার প্রার্থনা করে। বৃন্দাবন দাস পরবর্তীতে তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' লিখেছেন।^{১১৯}

'কেনে ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি ॥

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন।

তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন!!

আর ব্রাহ্মণদের কথা?^{১২০}

সাহিত্যিকী

‘কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পর ।
হরিদাসের সঙ্গে যদি না ছাড়ে আচার্য্য ॥
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্য ॥’

সেদিন হরিদাস তার উত্তরে যা বলেছিলেন তা যুগযুগ ধরে মানুষকে প্রেরণা যোগাবে ।
পঞ্চগনন সাহা মনে করেন ‘ধর্মান্ততার বিরুদ্ধে হরিদাসের উত্তর বর্তমানকালে বিশেষ প্রচার
হওয়া দরকার ।’ হরিদাস বলেন ^{১২১}

‘তুন বাপ, সভারই এক ঈশ্বর ॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে ।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরানে ॥
... ..
হিন্দুকে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥’

জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ চৈতন্যের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘জাতিভেদ না করিমু
চড়াল-যবনে ।’^{১২২} অতুলসুর জানান ‘বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষভাবে মুসলমান সমাজকে
প্রভাবিত করেছিল । ন্যূনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের
জানা আছে’ ।^{১২৩} সিলেট জেলার হাছন রাজার কাছে রাধা ও খোদার মধ্যে পার্থক্য নেই ।
তিনি বলেন ।^{১২৪}

‘রাধা বলিয়া ডাকিলে মুন্না মুঙ্গীরে দেয় বাধা ।
মুন্না মুঙ্গীর কথা যত সবলেই বেহুদা ॥

অতুল সুর তাঁর ‘বাঙলার সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থে জানান যে ‘হিন্দু মুসলমানের মুক্ত
সাধনায় পীরপূজা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত । পীর পূজাকে অবলম্বন করে হিন্দু
সমাজে অনেক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছি । তাদের অন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর গাজীসাহেব,
বনবিবি ইত্যাদি । এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে । সত্যপীরের
পূজা-কথায় বলা হয়েছে যে সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন । সত্যপীরকে অবলম্বন করে হিন্দু
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই অনেক পাঁচালী রচনা করেন । ফৈজুল্লার পাঁচালীতে
আছে ‘তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ । ওন গাজী আপনি আসরে দেহ মন ।’ তাই
^{১২৫}

‘হিন্দুর দেবতা হল মুসলমানের পীর
দুই কুলে সেবা লয় হইয়া হাজির ।’

মুসলমানের ‘সত্যপীর’কে হিন্দুরা ‘সত্যনারায়ণরূপে’ আত্মস্থ করেছিল । সাহা বলছেন ‘খুব
সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কোন অলৌকিকতা সিদ্ধ
মুসলমান ফকির বা পীরকে অবলম্বন করে তাঁর কাছে বা তাঁর মৃত্যুর পর হতে সত্যপীর

নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্মঃ ফিরে দেখা

বা সত্যনারায়নের পাঁচালীগুলি রচিত হতে আরম্ভ করে।^{১২৬} সত্যপীর পাঁচালীতে বলা হচ্ছে^{১২৭}

‘এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই।
সবলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোসাই ॥
... ..
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিচ্ছা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিচ্ছা কিছু ভিন্ন নয়।’

হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধের কথা সুস্পষ্টভাবে সত্যনারায়নের পাঁচালীতেও গীত হয়েছে।

‘সত্য পীর বলি সবে শিরে দিবে হাত।

নারায়ণ বলিয়া করিবে শ্রনিপাত ॥

কিংবা

‘হিন্দুর দেবতা তিনি
মুসলমানের পীর।
দুইবুধে সেবা লয়
হইয়া জাহির !!

অথবা

‘মক্কায় রহিম আমি
অযোধ্যায় রাম।
কলিতে সম্প্রতি
আমি সত্যনারায়ণ ॥’

পৃথিবীর দেশে দেশে লোক-সংস্কৃতির শক্তির কথা পূর্বে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে কতভাবে কতদিন থেকে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ আত্মস্থ করেছিলেন এবং বাংলার বাউল সুর তাঁকে কতভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছিল, সে সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বাউলরা জাত-পাত-হিন্দু-মুসলমান বিচার করে না। জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে তাঁরা মানুষে মানুষে মিলনের গান গেয়ে বেড়িয়েছেন বাংলার পথে-ঘাটে-হাটে-বাজারে-মানুষকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বাউল-ধর্ম সম্বন্ধে আবারও রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য তুলে ধরি। তিনি লিখেছেন ‘আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন।.....বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনাই দেখি-এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একত্রে হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।...এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কথা মিলেছে, কোরান পুরানে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধের বর্বরতা।^{১২৮} লালনের গান রবীন্দ্রনাথকে মানবধর্মে উজ্জীবিত হতে কতটা অনুপ্রাণিত করেছে, সে কথা আমরা তাঁর মানুষের ধর্ম বক্তৃতায় শুনেছি। ‘লালন জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য দেখেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মে কোন বিভেদ বোঝেন নাই। তিনি আল্লাহকে ‘অধরকাল্লা’ এবং মহম্মদ ও চৈতন্যদেব উভয়কেই

সাহিত্যিকী

সমানভাবে ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছেন।’ বলেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান বইতে।’^{১২৯} তরুণ সান্যাল বলেন ‘কাহারো মতে লালনের বাউল পূর্ব জীবন হিন্দু, কাহারো মতে ছিল মুসলমান।’^{১৩০} মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন ‘তাহাতে আদৌ কিছু আসে যায় না, কারণ তাঁহার সাধনাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।’^{১৩১} লালন বলেন

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জ্ঞাতের বিচার নাই!!^{১৩২}

জনৈক বাউল গেয়েছিলেন

‘আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের সহজ ঠিকানা,
যেথা আত্মা-হরি-কালী-গড এক খালাতে খায় খানা।’^{১৩৩}

নজরুল বলেন

‘নেই ক’ এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোড়া-ভিক্ষু এক গ্রাসে খায় জল।’^{১৩৪} (সাম্য)

বাউল মদন গেয়েছিলেন

‘তোমার পথ চাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই
চলতে না পাই,
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।
... ..
তোর দুয়ারেই নানান তালা
পুরান-কোরান তসবী মালা
ভেখ-পথই তো প্রধান ছালা, কাঁইদে মদন মরে খেদে।’^{১৩৫}

নজরুল গাইছেন

‘তব মসজিদে-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোড়া-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।’^{১৩৬} (মানুষ)

লালন বলে

‘মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।’^{১৩৭}

এমনি অনেক উদাহরণের উল্লেখ প্রমাণ করা যায় যে কাজী নজরুলের ওপর বাংলার লোকসংস্কৃতির কতটা প্রভাব ছিল। মুজফ্ফর আহমদ নজরুল স্মৃতিকথায় আমাদের জানান যে ‘নজরুলের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা পড়া ছিল। সেইসব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত।’^{১৩৮} সুশীল গুপ্তও জানান সে ‘তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও মেধা ছিল। তাঁর জ্ঞানপিপাসা শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেই সমীবদ্ধ থাকত না। যেখানে কীর্তন হত, কথকথা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরান-পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত

বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন^{১১৯} মোহিতলাল মজুমদার কিছুকাল তাঁর অভিভাবক সেজে কাজী নজরুল ইসলামকে 'সুয়োরানীর' স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আমরা নজরুলের মনের পরিচয় পাই আবদুল কাদিরকে লেখা তাঁর ২.১.১৯২৯ সালের একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন 'ভ্রগীটা থাকে নামের শেষে দিকে অর্থাৎ ওটা ন্যাজের শামিল। আর ও জিনিসটা অর্জন করার জন্য গর্ব আর যারাই করুন আমি পাইনি বলে বিধাতাকে তার জন্যে ধন্যবাদ দিই। ন্যাজ নিয়ে গর্ব করার মতো বুদ্ধি আছেন হয়নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি; আমি নীলাঙ্গুল।'^{১২০} আমরা যদি লেটোর দলের জন্য নজরুল ইসলামের ১২/১৩ বছর বয়সে লেখা 'শকুনিবধ', 'চাষার সঙ্গ', 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি পালাগান গুলির দিকে তাকাই, দেখা যাবে মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের মত তিনিও লিখেছেন 'নজরুল ইসলাম বলে', 'কয় নজরুল ইসলামেতে' 'সর্ব প্রথমে বন্দনা গাই' ইত্যাদি ফর্মটা ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের অসাম্প্রদায়িক লোক সংস্কৃতির চিন্তায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের এই যে সচেতন সমন্বয়ের প্রচেষ্টা সেটা যে সমাজ বাস্তবতার প্রয়োজনেই বিস্তার লাভ করেছিল, সেকথা আজ মধ্যযুগের পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির গবেষক প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করেন। ক্ষিতিমোহন সেন কবীর তথা মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সার সংকলন করেছেন এইভাবে। 'সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য সব কৃত্রিম বাধা পরিত্যাগ করিয়া সত্য হও, সহজ হও। সত্যই সহজ। সেই সত্যকে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইবার দরকার নাই। তীর্থে, ব্রতে, আচারে, তিলকে, মালায়, ভোখে, সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নাই। সত্য আছে অন্তরে, তার পরিচয় মেলে প্রেমে, ভক্তিতে, দয়ায়। কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না, হিংসা করিবে না কারণ প্রতি জীবে ভগবান বিরাজিত। বিভিন্ন ধর্মের নাম-ভেদের মধ্যেও সেই এক ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা-কাজেই ঝগড়া বৃথা। হিন্দু মুসলমান বৃথাই ঝগড়া করিয়া মরিল। অহঙ্কার দূর করিয়া, অভিমান ত্যাগ করিয়া, কৃত্রিমতা ও মিথ্যা পরিহার করিয়া সকলকে আত্মবৎ মনে করিয়া ভগবৎ প্রেমে ভক্তিতে চিত্ত পরিপূর্ণ কর-তবেই সাধনা সফল হইবে।'^{১২১} মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মনে করেন 'মানুষের ভিতরকার এই শ্রেষ্ঠত্বকে উদ্ঘাটিত করিয়া চলিয়াছেন আমাদের দেশের খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা লোকসঙ্গীত রচয়িতারা। প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, ও মানসিক পরিবেশকে অতিক্রম করিয়া দয়ামায়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার চিত্র অঙ্কন করিয়া চলিয়াছেন। নিরন্তর তাহারা মানুষে মানুষে মিল খুঁজিতেছে। যেমন, জলে যেমন জল মিশে, তেমনি মনে মন মিশাতে চাহেন তাহারা। লোকসঙ্গীত সাধনায় ইহা বড় কথা। এই সাধনার সাম্প্রদায়িকতা নাই। রাজনৈতিকতা নাই। স্বাভাবিক ও মহৎ জীবন চর্চাই প্রধান।'^{১২২}

হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া মধ্যযুগের এই সমন্বয়ধর্মী অসাম্প্রদায়িক লোক-সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যের উত্থানের প্রধান মনে করলে ভুল মনে করা হবে না। তেমনি বিশ শতকের শুরু থেকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, হানাহানি, মারামারির মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দূত হিসেবে

আভির্ভূত হয়েছিলেন যুগের দাবিতেই। তদুপরি পোদ্দার জানান যে মধ্যযুগে 'যেসব সাধক সমস্ত বিরোধ ও বিভেদ অতিক্রম করে একটি সৃষ্টিশীল সমন্বয়ে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তর থেকে উদ্ধৃত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্বগামীদের মধ্যে নামদেব ছিলেন দরজী, নানক ছিলেন চাষীর সন্তান, সদন কসাই, এবং রামানন্দ স্বয়ং ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে, রবিদাস চামার, কবীর জোলা মুসলমান, ধন্বা জাঠ, সেনা নাপিত, পীপা রাজপুত; চৈতন্য পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সাধকের মধ্যে দাদু ও রজ্জবের জন্ম তুলা ধুনকর বংশে, এবং সুরদাস জাতিতে বৈশ্য, তুকারাম চাষীর সন্তান। ভক্তিবাদের আদি প্রচারক দাক্ষিণাত্যের অলওয়ার সম্প্রদায়ের অধিকাংশই নীচকুলজাত, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা; তিনি জাতিতে অস্পৃশ্য পারিয়া। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের নিম্নাংশেই শান্তির, ঐক্যের এবং সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কেননা, সামাজিক রক্ষিত অরাজকতার মধ্যে সমাজের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরাই পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাপেক্ষা বেশী।^{১৪০} নজরুলও নিম্নকোটি সমাজের মানুষ। দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামই নজরুল জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দারিদ্রের চাপে নজরুলের বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়নি। তাই সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু মুসলমানের দিনরাত্রির হানাহানি যৌবনে নজরুলকেও পীড়িত করে। অন্তরদিয়েই তিনি হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন-তাই তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কলম যতদিন সচল ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলনের ঐক্যের ও শান্তির গান গেয়ে গেছে। অন্তর দিয়েই বুঝেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতা সমাজের নিম্নকোটি মানুষের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশী আর তাতে লাভবান হয় সবচেয়ে বেশী উচ্চস্তরের মানুষ। তাই সাম্যবাদ ও মানবধর্মের জন্য নজরুলকে অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। স্বাভাবিকভাবে, অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই, জন্ম থেকেই নজরুলের মধ্যে সাম্যবাদ ও মানবধর্মের বীজ রোপিত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়ের পর স্বাভাবিক ভাবেই নজরুলের মধ্যে সাম্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই 'সদ্য; কর্ষনে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়' সে সৌরভটি নজরুলের শরীরের গন্ধে তাই পেয়েছিলেন। 'মাটির কাছাকাছি যে কবির জন্য রবীন্দ্রনাথ কান পেতেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম সেই কবি। কথায় বলে 'রতনে রতন চেনে'। রবীন্দ্রনাথ যেমন লালন, হাছন রাজা, গগন হরকরাসহ আরো অনেক বাউলকে চিনেছিলেন এবং বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, নজরুলকেও তিনি অন্তরদিয়েই চিনেছিলেন। নজরুলকে উপলব্ধি করতে হলে হৃদয় দিয়েই তা করতে হবে, বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য দিয়ে নয়। ইংরেজি বাগীশের হাতেকলমে তৈরি বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ 'সুয়োরাগী' বলে চিহ্নিত করেছেন। সে সুয়োরাগী তাঁর কথায় বন্দ্য, নিষ্ফলা।' আর বসনভূষনহীন, সর্বাপেক্ষা ধূলোমাটি মাখা শিশুটি হল প্রকৃত দেশজ ভাব ও ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ একে 'দুয়োরাগী' আখ্যা দিয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে কাজী নজরুল

ইসলাম ‘সুয়োরানীর’ আদর যত্ন ও সম্মানে বক্ষ্যা ও নিষ্কল্যা’ হয়ে আরো অনেকের মত বাংলা সাহিত্যের জগৎ থেকে হারিয়ে যান নি। এটা আমাদের সৌভাগ্য। বরং ‘ধুলোমাটিমাখা দুয়োরানী’ হয়ে তিনি এখনো বাঙালির জীবনে দীপ্যমান।

চার

‘মধ্যযুগের সাধকগণ তাঁদের নিষ্কলুষ চরিত্র, অসামান্য নিষ্ঠা ও সাধুতা এবং অননুকরনীয় ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা সমাজে জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং শ্রেয়োবোধ হারিয়ে ফেলা মানুষের হৃদয়ে মানবপ্রীতির উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের আদর্শ সমাজদেহে প্রবল তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করলেও এবং এই আদর্শের সত্যতা গভীরভাবে অনুভূত হয়ে থাকলেও, তাঁরা স্থায়ীভাবে সমাজে তাঁদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেন না।’^{১৪৪} কেন পারলেনা, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন অরবিন্দ পোন্দার। তিনি লিখেছেন ‘তাঁদের বিদ্রোহ ছিল মূলত গভীর আধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের আমল পর্যন্ত সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ধর্মকে আলম্বন করেই বিভিন্ন সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মীয় চিন্তাধারাই মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের সাধকরাও তাঁদের সমকালীন সামাজিক পরিবেশকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন।’^{১৪৫} দুর্বলতা সেখানেই। তাঁদের সেই ‘আধ্যাত্মবাদের মধ্যেই ছিল চরম দুর্বলতা। যে সমাজ বাস্তবতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় সংঘাত, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি ও কলহের মূল উৎস, তাঁরা সেই বাস্তব সমাজ সংগঠনের শরীরে ‘সামান্য আঁচড় দিতে পারেন নি বা সে চেষ্টা ও বোধও তাঁদের ছিল না।’^{১৪৬} তাই ‘তাঁদের বিশ্বাস ছিল, হৃদয়ের প্রীতি দিয়েই সমস্ত বৈষম্যকে জয় করা যাবে, তাই সংঘবদ্ধ সামাজিক ক্রিয়ার চেতনা তাঁদের মানস পরিমন্ডলে স্থান পায় নি। কিন্তু নিছক ভাব-বিপ্লব যে বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক রূপান্তরিত করতে পারে না, তা তাঁদের ব্যর্থতা থেকে পুনরায় প্রমাণিত হল।’^{১৪৭} পঞ্চানন সাহাও মনে করেন ‘হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু হিন্দু মুসলমান এই উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মিলনে এক পরিপূর্ণ ভারতীয় জাতীয়তা গড়ে ওঠেনি।’^{১৪৮} এ নিয়ে অনেকের সাথে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ কম ছিল না। তিনিও হিন্দু মুসলমান মিলনে সন্দেহান ছিলেন। তিনি লিখেছেন ‘আমরা বহুশত বছর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখের মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটা পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি না। এ পাপ ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।’^{১৪৯} একই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন ‘ইহার যা ফল

সাহিত্যিকী

তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিস্তার নাই।^{১৫০} মধ্যযুগের বাংলার আউল-বাউল ও লোক সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারাটি বিংশ শতাব্দীতে এসে কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে পুনরায় প্রবল হয়ে উঠে ধূমকেতুর মত বাংলার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের সে আদি পাপকে হত্যা করা যায় নি। কাজী নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার সে দানবটিকে বাঁধতে পারেন নি। সেদিক থেকে বিচার করলে অরবিন্দ পোন্ধরের সুরে সুর মিলিয়ে বলতেই হয় কাজী নজরুল ইসলামের সে শুভ ও মানবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

তবুও শেষে তার সুরে সুর মিলিয়ে বললো 'তারা ব্যর্থ হয়ে থাকলেও শুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রে তারা যে সত্য ও সমন্বয়ে উপনীত হয়েছিলেন, তাঁদের কালের মানুষের সম্মুখে যে মানবতার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তার গুরুত্ব কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীকে সুন্দরের ও কল্যাণের আবাসভূমিতে পরিণত করার জন্য যারা (আজও) সংগ্রাম করছেন, তারা তাঁদেরই অংশীদার।'^{১৫১} তাঁরাই কাজী নজরুল ইসলামকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' চন্ডীদাসের সেই কবেকার সত্যোপলব্ধি বিংশ শতাব্দীর নজরুলের কণ্ঠে অনুরণন তোলে

গাংহি সাম্রাজ্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' (মানুষ)

বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার বিষবাক্ষেপ পৃথিবীর আকাশে বাতাসে মানবাত্মার মৃত্যু-যন্ত্রণা বন্ধ করে না, বর্তমান পৃথিবীকে সুন্দর ও কল্যাণকর আবাসভূমিতে রূপান্তর করা যাবে না; বর্তমান পৃথিবীতে অসাম্যের অর্থনীতি মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলে রাখবে, বর্তমান কাজী নজরুল তাঁর এই মহান বাণীর সাহায্যে ভবিষ্যতের মানুষকেও এমনভাবে জয়গান গাইতে অনুপ্রেরণা জোগাবে, উদ্বুদ্ধ করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তার ভবিষ্যতে যারা সাম্যবাদ ও মানবধর্মের গান গাইবেন, লিখবেন, আন্দোলন করবেন, তাঁদের অবশ্যই নজরুল ইসলামের সাম্যবাদ ও মানবধর্মকে সঠিক তত্ত্বের ভিত্তিতে পন্থার ওপর দাঁড় করাতে হবে।

সূত্র নির্দেশ :

১. নজরুল আহমদ: কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৯ পৃ: ১৫৮)।
২. ঐ পৃষ্ঠা ২০৯।

নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্মঃ ফিরে দেখা

৩. ঐ পৃষ্ঠা ১৯৫।
৪. ঐ পৃষ্ঠা ২০৬।
৫. ঐ পৃষ্ঠা ২০৩।
৬. ঐ পৃষ্ঠা ২১১।
৭. নারায়ণ চৌধুরী : নজরুল-চর্চা, মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪৭-৫১।
৮. ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত : নজরুল চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪৩।
৯. ঐ পৃষ্ঠা ৩০।
১০. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ১৯৫।
১১. ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ১৬৩।
১২. নারায়ণ চৌধুরী : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ২১।
১৩. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী : প্রথম খন্ড, সম্পাদনা : আবদুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৮ পৃষ্ঠা ৪৩৩।
১৪. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ২১৩।
১৫. ঐ : পৃষ্ঠা ২১০।
১৬. শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রবীন্দ্ররচনাবলী' চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ পৃষ্ঠা ১০২২।
১৭. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিক কমিউনিজম, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভাবাদর্শের ভূমিকা' কলকাতা ১৯৬৬ পৃষ্ঠা ১৪; উদ্ধৃত এম.এ. পারসিৎস : সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, রতন সেন (অনূদিত) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৩৯।
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯।
১৯. এম.এ.পারসিৎস : সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, অনুবাদ : রতন সেন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৯৫।
২০. বদরুদ্দীন উমর : ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, একুশ ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৯৮।
২১. ঐ : পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯।
২২. ঐ : পৃষ্ঠা ৯৯।
২৩. মুজফ্ফর আহমেদ : আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, ১৯২০-১৯২৯, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৭ পৃষ্ঠা ১৩।
২৪. মুজফ্ফর আহমদ : ঐ পৃষ্ঠা ১৪৪।
২৫. মুজফ্ফর আহমদ : ঐ পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫।
২৬. এম.এ. পারসিৎস : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ৮০।
২৭. এম.এ. পারসিৎস : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ২৩।
২৮. ঐ : পৃষ্ঠা ৩১।
২৯. ঐ : পৃষ্ঠা ৭৬।
৩০. ঐ : পৃষ্ঠা ৪৮।

৩১. ঐ : পৃষ্ঠা ৭৬।
৩২. ঐ : পৃষ্ঠা ৭৬।
৩৩. ঐ : পৃষ্ঠা ৩২।
৩৪. ঐ : পৃষ্ঠা ৩৩।
৩৫. ঐ : পৃষ্ঠা ৯৫।
৩৬. ঐ : পৃষ্ঠা ১০৫।
৩৭. ঐ : পৃষ্ঠা ১০৫।
৩৮. ঐ : পৃষ্ঠা ১০৬।
৩৯. ঐ : পৃষ্ঠা ১০৬।
৪০. ঐ : পৃষ্ঠা ১০৫।
৪১. ঐ : পৃষ্ঠা ১৩১।
৪২. ঐ : পৃষ্ঠা ১৩৬।
৪৩. ঐ : পৃষ্ঠা ১৩০।
৪৪. ঐ : পৃষ্ঠা ১২৮।
৪৫. ঐ : পৃষ্ঠা ১২৯।
৪৬. ঐ : পৃষ্ঠা ১২৯।
৪৭. ঐ : পৃষ্ঠা ১২৯।
৪৮. ঐ : পৃষ্ঠা ১৩০।
৪৯. মুজফ্ফর আহমদ : আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃষ্ঠা ১৫১।
৫০. এম.এ. পারসিৎস্ : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ১৩০।
৫১. ঐ : পৃষ্ঠা ১৩০।
৫২. ঐ : পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫।
৫৩. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ২৪
৫৪. মানবেন্দ্রনাথ রায় 'স্মৃতিচারণ' ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ২২-২৯, উদ্ধৃত পারসিৎস্, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯
৫৫. পারসিৎস্ : ঐ পৃষ্ঠা ১১৯।
৫৬. ঐ : পৃষ্ঠা : ১১৯।
৫৭. ঐ : পৃষ্ঠা : ১২০।
৫৮. ঐ : পৃষ্ঠা : ১২০।
৫৯. ঐ : পৃষ্ঠা : ১২০।
৬০. ঐ : পৃষ্ঠা : ১২০।
৬১. মুজফ্ফর আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭।
৬২. M. N. Roy's Memoirs, Allied Publishers P.P. 464-65
উদ্ধৃত মুজফ্ফর আহমদ, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৩৭।
৬৩. মুজফ্ফর আহমদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।
৬৪. ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৬৪।
৬৫. আহমদ শরীফ: একালে নজরুল, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ পৃষ্ঠা ১০৪

নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্মঃ ফিরে দেখা

৬৬. নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খন্ড বাংলা একাডেমী, সম্পাদক আবদুল কাদির ২য় সংস্করণ ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ৭০৯।
৬৭. ঐ, বাংলা একাডেমী, সম্পাদক, আব্দুল কাদির ২য় সংস্করণ ১৯৮৪ পৃষ্ঠা-৭০৯।
৬৮. মুজফ্ফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২২৮।
৬৯. ঐ : পৃষ্ঠা ২৩০।
৭০. ঐ : পৃষ্ঠা ২৩০।
৭১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৪৯।
৭২. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০।
৭৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৪৯।
৭৪. ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত: নজরুল চরিতজানস 'প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫।
৭৫. আহমদ শরীফ : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩।
৭৬. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪২৬।
৭৭. নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, জুন ১৮৮৩ পৃষ্ঠা ৭৪৫।
৭৮. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮।
৭৯. কাজী আব্দুল ওদুদ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৪২৭।
৮০. ঐ : পৃষ্ঠা ৪৩৩।
৮১. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।
৮২. ঐ : পৃষ্ঠা ২৩।
৮৩. ঐ : পৃষ্ঠা ১৯৫-৯৬।
৮৪. আহমদ শরীফ : প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ১০৪।
৮৫. মুজফ্ফর আহমদ : প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৪৩।
৮৬. বিনয় ঘোষ : বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জৈষ্ঠ ১৩৯৬।
৮৭. ঐ : পৃষ্ঠা ৩।
৮৮. ঐ : পৃষ্ঠা ১০।
৮৯. ঐ : পৃষ্ঠা ৮।
৯০. ঐ : পৃষ্ঠা ৮-৯।
৯১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামনি ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ৭।
৯২. বিনয় ঘোষ : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ১৪।
৯৩. ঐ : পৃষ্ঠা : ১৯।
৯৪. ঐ : পৃষ্ঠা ১৯।
৯৫. ঐ : পৃষ্ঠা ২৪।
৯৬. নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ২য় খন্ড, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৫।

সাহিত্যিকী

৯৭. নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৯০।
৯৮. ঐ : পৃষ্ঠা ৭২৫।
৯৯. ডঃ পঞ্চানন সাহা হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক: নতুন ভাবনা, বিশ্ববীক্ষা, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৮।
১০০. ঐ : পৃষ্ঠা ৩৮।
১০১. ঐ : পৃষ্ঠা ৪২।
১০২. ঐ : পৃষ্ঠা ৪৪।
১০৩. অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, উচ্চারণ, কলিকাতা, জুলাই ১৯৮১ পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮।
১০৪. ডঃ পঞ্চানন সাহা প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৪৭।
১০৫. অরবিন্দ পোদ্দার : প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ১৭৮।
১০৬. ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা, পৃষ্ঠা ৫০-৫১; উদ্ধৃত অরবিন্দ পোদ্দার : প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯।
১০৭. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাণ্ডক্ত; উদ্ধৃত অরবিন্দ পোদ্দার, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০।
১০৮. অরবিন্দ পোদ্দার, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ১৭৯।
১০৯. ঐ : পৃষ্ঠা ১৭৯।
১১০. ঐ : পৃষ্ঠা ১৭৯।
১১১. পঞ্চানন সাহা : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।
১১২. অরবিন্দ পোদ্দার : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ১৮০।
১১৩. ঐ : পৃষ্ঠা ১৮০।
১১৪. ডঃ পঞ্চানন সাহা : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮।
১১৫. রবীন্দ্র রচনাবলী সংগীত, শত বার্ষিকী সংখ্যা, চতুর্দশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৮৭।
১১৬. ঐ : দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭৯।
১১৭. ডঃ পঞ্চানন সাহা : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯।
১১৮. ঐ : পৃষ্ঠা ৫১।
১১৯. ঐ : পৃষ্ঠা ৫১।
১২০. ঐ : পৃষ্ঠা ৫১।
১২১. ঐ : পৃষ্ঠা ৫২।
১২২. ঐ : পৃষ্ঠা ৫০।
১২৩. ঐ : পৃষ্ঠা ৫৪।
১২৪. ঐ : পৃষ্ঠা ৫৫।
১২৫. অতুল সুর : বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮২ পৃষ্ঠা ৬৮ উদ্ধৃতি পঞ্চানন সাহা, প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা ৫৭।
১২৬. ডঃ পঞ্চানন সাহা : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭।
১২৭. ঐ : পৃষ্ঠা ৫৮।
১২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাউল গান' প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৪ পৃষ্ঠা ৭৪৪-৪৫। উদ্ধৃত সাহা পৃষ্ঠা ৬১।
১২৯. ডঃ পঞ্চানন সাহা : প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৬২।

নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবধর্মঃ ফিরে দেখা

১৩০. ঐ : পৃষ্ঠা ৬২।
১৩১. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন : হারামনি, ৭ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংকরণ ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ভূমিকা ২০।
১৩২. দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ : (প্রথম খন্ড) সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, রিস্ট্রেস্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ৫ম মুদ্রন ২য় জানুয়ারি ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ১৪।
১৩৩. ডঃ পঞ্চানন সাহা : প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ৬৪।
১৩৪. নজরুল রচনাবলী, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ১৯।
১৩৫. ফিতিমোহন সেন : ভারতে হিন্দু মুসলমানের মুক্ত সাধনা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৩০ উদ্ধৃত পঞ্চানন সাহা, প্রাপ্ত ৬৪-৬৫।
১৩৬. নজরুল রচনাবলী প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৭। ২য় খন্ড
১৩৭. দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১৫।
১৩৮. মুজিবুর আহমদ : নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা ৭৭।
১৩৯. ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৩৩।
১৪০. নজরুল রচনাবলী পঞ্চম খন্ড, দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৩১৭।
১৪১. ফিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা, পৃষ্ঠা ৭১; উদ্ধৃত অববিন্দ পোদ্দার : প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১৮১।
১৪২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ভূমিকা ১৫।
১৪৩. অরবিন্দ পোদ্দার : প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২।
১৪৪. অরবিন্দ পোদ্দার : প্রাপ্ত, ১৮২-১৮৩।
১৪৫. ঐ : পৃষ্ঠা ১৮২।
১৪৬. ঐ : পৃষ্ঠা ১৮২।
১৪৭. ঐ : পৃষ্ঠা ১৮৩।
১৪৮. পঞ্চানন সাহা : প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৭১।
১৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ব্যর্থ ও প্রতিকার রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২।
১৫০. ঐ : পৃষ্ঠা ৩৫২।
১৫১. অরবিন্দ পোদ্দার : প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩।

